সানন্দা

মা

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে ‘হরপ্পা’-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে ২১ অক্টোবর ২০২৩
শারদীয় মহাসপ্তমী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত হল
‘মা’

প্রচ্ছদ ও শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

বিশেষ সহযোগিতা
সৌম্যদীপ
সম্পাদনা
সৈকত মুখার্জি
বিশেষ কৃতজ্ঞতা:
অভীককুমার দে, ঈষিতা চক্রবর্তী, উৎপল চক্রবর্তী,
দেবাশিস বসু, পার্থ দাশগুপ্ত, প্রসেনজিৎ দাশগুপ্ত,
ভাস্কর দাস, সৌমিত্রশঙ্কর সেনগুপ্ত

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

২০২০ খ্রিস্টাব্দ আমাদের জীবনের এক কঠিন সময়। মারণ-রোগ করোনার প্রকোপে সারা পৃথিবীর লোক তখন মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। স্তব্ধ হয়ে যায় সব কিছু। রাস্তায় বেরলে নিতে হত নানা সতর্কতা, পদে পদে ডিঙোতে হত নানা নিয়মের বেড়া। জীবিকাশূন্য হয়ে নিজের ভিটেতে ফেরা মানুষকেও সন্দেহের চোখে পড়তে হয়েছে বারংবার। এমনই সংকটকালে ‘হরপ্পা লিখন চিত্রণ’-এর পক্ষ থেকে বেশ ক’টি বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের পর শরতের আগমনে ছাপা হয়েছিল অক্টোবর ২০২০ ‘দুর্গতিনাশিনী’ মুদ্রিত সংখ্যাটি। রূপং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি—এই তিনটি অংশের শেষে সংযোজিত হয়েছিল ‘মা’ শীর্ষক একটি বিশেষ অংশ। সে-অংশে তুলে ধরা হয়েছিল—“তেরোজন বর্ষীয়সী নারীর পুজোর অভিজ্ঞতার সংকলন। এঁদের

কারোর জন্ম গত শতকের দুয়ের দশকে কারো ওই শতকেরই চারের দশকের শেষ পাদে। কেউ জন্মেছেন মেদিনীপুরে, কেউ-বা ফরিদপুরে, কেউ আবার মুর্শিদাবাদে। পেশাগত জীবনেও বৈচিত্র্য রয়েছে এঁদের। বয়স অনুযায়ী এই মায়েদের দুর্গাপুজোর অভিজ্ঞতা পরপর সাজানো হল। চেষ্টা করা হল বানান ও অন্যান্য শুদ্ধীকরণ-সম্পাদনা ছাড়াই সেই স্মৃতিকথাগুলি পাঠকের কাছে তুলে ধরার।"

আজ এই তেরোজনের মধ্যে তিনজন—সতী দাশগুপ্ত, ইরা দত্ত ও সলিলা দাস—আর আমাদের মধ্যে নেই।

১৪৩০ সালের উৎসবের আনন্দক্ষণে এই পুস্তিকা প্রকাশ তাঁদের প্রতি 'হরপ্পা'-র একটি শ্রদ্ধার্ঘ্য। পাশাপাশি অক্টোবর ২০২৩-এ প্রকাশিত 'হরপ্পা লিখন চিত্রণ'-এর 'বাঙালি মহিলাদের লেখালিখি'-র বৈদ্যুতিন সংযোজন হিসেবেও পাঠক এটিকে বিবেচনা করতে পারেন।

আমার স্মৃতিতে দুর্গাপুজো	৬	আভারাণী ঘোষ
আমার ছোটবেলায় দেখা পূজো	১৪	গৌরী সেন
বেলতলীতে কয়েকবার দুর্গোৎসব	২২	সতী দাশগুপ্ত
অশীতিপরার দুর্গাদর্শন	২৮	কৃষ্ণা কুন্ডু
শরতের দুর্গা নয় বসন্তের বাসন্তী আমাদের মা	৩৬	নমিতা চক্রবর্তী
শারদোৎসবের সেকাল-একাল	৪২	ইরা দত্ত
ফিরে দেখা দুর্গা পুজো	৫৪	প্রণতি মুখোপাধ্যায়
পুজোর পাঁচালী	৬৮	শান্তা ভট্টাচার্য
স্মৃতির দুর্গাপুজো	৭৮	সলিলা দাস
আমার দুর্গা পূজা দেখা	৮৬	অঞ্জলি সেনগুপ্ত
ফিরে দেখা দুর্গা পুজো	৯২	গোপা দাশগুপ্ত
দুর্গোৎসব	৯৬	মুক্তি রায়
ছোটবেলার দুর্গোৎসব	১০২	দীপালি বিশ্বাস

আভারাণী ঘোষ

আমার স্মৃতিতে দুর্গাপুজো

*১৯২৩-এ জন্ম আভারাণী ঘোষের মেদিনীপুর জেলার কেলোমালে।
বিবাহসূত্রে তিনি চব্বিশ পরগনার করঞ্জলির ঘোষবাড়িতে
বধূ হয়ে আসেন সতেরো বছর বয়সে।*

মা

আমার জন্ম ১৯২৩ সালে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার কেলোমাল-এ। আমার বাবার ঠাকুরদা আমাদের বাড়িতে দুর্গামার পুজো চালু করেন। তারপর আমার ঠাকুরদা এবং পরে বাবা বৈদ্যনাথ সরকার এবং কাকা বিশ্বনাথ সরকার সেই পুজো করতেন। আমাদের বাড়িতে যে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল সেখানে দুর্গামার মূর্তি তৈরি হত, ওইখানেই পুজোও হত। বোধনের দিন সব ঢাক-ঢোল বাজিয়ে আট-দশজন রুপোর আসাসোঁটা নিয়ে ঘট ডোবাতে যেত বাড়ির কাছের শান-বাঁধানো পুকুরে, যার দু-পাশে দুটো শিবমন্দির আছে। ঘট ডোবানো হলে ঠাকুরমশাই পুকুরের কাছে একটা ঘেরা বেলগাছতলায় সে ঘট রেখে দিত। ওই দিন থেকে ঘট ডোবানোর ঘাটের আগে আমাদের নহবতখানায় তিনতলার ওপরে বাজনা বাজানো শুরু হত। ভোর চারটে

থেকে সানাই বাজত। আবার ষষ্ঠীর দিন থেকে নহবত বাজানো হত। ওইদিন একইভাবে বাজনা বাজিয়ে আসাসোঁটা নিয়ে ঘট ডোবাতে যাওয়া হত, শাঁখ বাজিয়ে সেদিন বেলগাছের গোড়া থেকে ওই ঘটটাও নিয়ে আসা হত। ঘটটা নিয়ে এসে চণ্ডীদালানে পুজোর জায়গায় বসিয়ে দেয়া হত। এরপর ঠাকুরমশাই পুজো আরম্ভ করতেন।

মূলত দুজন ঠাকুরমশাই ছিলেন—একজন পুজো করতেন আর একজন তন্ত্রধারক। তন্ত্রধারক পাঁজি দেখে-দেখে মন্ত্র পড়ে যেতেন। পুরোহিতমশাই পুজো করতেন। ষষ্ঠী থেকেই চণ্ডীপাঠও হত। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের পাশেই একটা ছোট্ট ঘর ছিল, তার দরজা থাকলেও কপাট ছিল না। সে-ঘরে একটা এক মানুষ গর্ত থাকত, উপরের মুখটা অবশ্য দু-তিনফুটের। সেই গর্তে কাঠ দিয়ে হোমের আগুন সর্বক্ষণ জ্বলত, নিভত না। ওই ঘরটাকে হোমঘর বলত।

আমাদের বাড়ির প্রতিমা তো কুমোরে বানিয়ে দিত। মায়ের মূর্তির পেছনে চালচিত্র থাকত। চালচিত্রের ঠিক মাঝখানে মায়ের মাথার পেছনে শিবের ছবি থাকত। মায়ের হাতে ত্রিশূল থাকত অসুরের বুকে গাঁথা। অন্য হাতগুলোয় শঙ্খ, কাতান, এক হাতে অসুরে চুলের মুঠি বেশ করে ধরা থাকত। বাড়িতে মায়ের রুপোর গয়না ছিল। পুজো হয়ে গেলে সাবানটাবান দিয়ে ধুয়েটুয়ে রাখা থাকত। পুজোর সময় আবার পরানো হত। আর চারটে—দুটো বড়ো দুটো ছোটো—চামর ছিল। বড়ো দুটো বাবা আর কাকা দোলাত, ছোটো দুটো ভায়েরা দোলাত।

গণেশের বউ হিসেবে কলাবউকে থাকত। কলাবউকে স্নান করিয়ে নিয়ে আসা হত ওই ঘট ডোবানোর ঘাট থেকে। কলাবউকে স্নান করিয়ে পাঁচরকমের পাতা দিয়ে (অশ্বথ, বট, বেল—সব পাতার নাম এখন আর মনে নেই) বেঁধে দিয়ে, ওপরের পাতাটা সমান করে সিঁদুর লাগিয়ে, নতুন কাপড় পরিয়ে ঘোমটা দিয়ে কুঁচিয়ে দিতেন ঠাকুরমশাই। তারপর বরণ করে কলাবউকে এনে মায়ের ডানদিকে গণেশের পাশে রাখা হত। পুজোর সময় ঠাকুরের সামনে ফলমূল, বাড়িতে বানানো নাড়ু রাখা হত। কড়াইয়ে করে অনেক নাড়ু বানানো হত বাড়িতে। সেগুলো কাঠের তেপায়ার ওপর থালায় বা বারকোষে করে রাখা হত। মেঝেতে সরাসরি কোনোদিন রাখতে দেখিনি। পঞ্চাশটা তেপায়া ছিল—ডানদিকে পঁচিশটা বাঁ-দিকে পঁচিশটার ওপর সব সাজানো হত। আমাদের বাড়িতে পাঁচজন বামুন পুজোর জোগাড় করত। তাদের জন্য নতুন কাপড় থাকত, হলুদে ছোপানো। গঙ্গাজল ছিটিয়ে সেই কাপড় পরে তারা পুজোর জোগাড় করত। পুজো শেষে ধুয়ে রাখত, পরদিন আবার গঙ্গাজল ছিটিয়ে পরত। তবে আমাদের বাড়িতে দেবীমাকে ভোগ দেওয়া হত না—ভোগ খালি বামুন বাড়িতে দেওয়ার নিয়ম ছিল।

আমাদের বাড়িতে বলি হত। পাঁঠাবলি তো হতই, মহিষবলি হতে ছোটোবেলায় দেখেছি। মহিষটার গলায় একটু গরম করে তেল মাখিয়ে নিত। এদিকে পুজো হত, ওদিকে মহিষের গলায় দলাইমলাই করে তেল মাখাত। তারপর ডাক পড়লে গঙ্গাজল ছিটিয়ে মহিষটাকে নিয়ে যাওয়া হত হাড়িকাঠে, পাঁঠাবলির থেকে বড়ো কাতান দিয়ে বলি দেওয়া হত। পাঁঠাবলিও ওই

একইভাবে হত। পাঁঠাগুলোকে নিয়ে যাওয়া হত পুকরে চান করাতে। তারপর ঠাকুরমশাই মন্ত্র পড়ে মালা পরিয়ে দেওয়া হত। এরপর হাড়িকাঠে নিয়ে যাওয়া হত। হাড়িকাঠ সপ্তমীর দিন বসত আর নবমীর অঞ্জলি হয়ে গেলে তুলে দেওয়া হত।

মহাষ্টমীর দিন বলি হত না। অঞ্জলি দিত সবাই। নবমীর দিন সকলে মিলে একশোআট প্রদীপ জ্বালত। যারা বাইরের থেকে আসত তারাও জ্বালত। ওদিন কুমারীপুজোও হত। বলা হত, মায়ের নাকি কুমারী রূপ। বামুনের বাড়ির মেয়েকে বলা থাকত। তাকেই কুমারী রূপে পুজো করা হত। আগে ঠাকুমা, পরে মা কুমারী পুজো করত। কুমারীর গলায় মালা পরানো হত, তার পা কলাপাতার ওপর থাকত।

ওইদিন বামুন খাওয়ানো হত। পাড়ার অন্য লোকেদেরও নেমন্তন্ন থাকত। হালুইকর রাঁধত। বামুনরা একদিকে বসত, অন্যরা আরেকদিকে। আমার বাবা তমলুকের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তমলুকের এসডিও বাবার বন্ধু ছিলেন। উনি আসতেন সাদা বড়োসড়ো ঘোড়ায় চড়ে। এরকম তমলুক থেকে দুজন মেদিনীপুর থেকে তিনজন আসতেন। তাঁদের চণ্ডীদালানে বসানো হত না। চণ্ডীদালানের সামনে মায়ের সোজাসুজি চেয়ারটেবিল পেতে ত্রিপলের তলায় বসানো হত। তাঁরা চলে গেলে সেগুলো সরিয়ে ফেলা হত। তবে মাতঙ্গিনী হাজরা যখন তমলুক কোর্টের দিকে পতাকা তুলবে বলে এগিয়ে আসছিল তখন সায়েবরা বাবাকে গুলির অর্ডার দেওয়ার কথা বলেছিল, বাবা দেয়নি। বলেছিল—আমার ঠাকুমার কাছে প্রতিজ্ঞা

করেছি আমি কাউকে জীবন দিতেও পারব না, কারোর জীবন নিতেও পারব না। ওরা তখন বলেছিল, তুমি আদেশ অমান্য করছ, আজই তোমায় চাকরি ছাড়তে হবে। বাবা চাকরি ছেড়ে দেয়। তখন বাবার বন্ধু, তমলুকের রাজার ছেলে—যিনি বাবার সঙ্গেই পড়তেন তমলুক কলেজে—শুনেছি অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে সেই অর্ডার দেন।

পুজোর সময় আমাদের বাড়ি অনেক লোক আসত। আমার পিসিরা আসত, তাদের বাড়ির লোকেরা আসত। মহিষাদলে আমার মামার বাড়ি থেকেও লোকজন আসত। আমার বড়োপিসির বিয়ে হয়েছিল যুগান্তর-অমৃতবাজারের বাড়িতে। এডিটর ছিলেন তুষারকান্তি ঘোষ। আমার বড়ো পিসেমশাই অনেক আগে মারা গিয়েছিলেন। তবে অন্যরা আসতেন। মেজোপিসির বিয়ে হয়েছিল গড়পারের জগবন্ধু বোসের সঙ্গে। উনি ডাক্তার ছিলেন। পিসেমশাই আসতেন না, উনি অন্যসময় বিয়েটিয়েতে আসতেন, তবে অন্যরা আসত। এছাড়া আরও অনেকে আসত, খুব আনন্দ হত।

নবমীর পরদিন দশমীতে পুজো শেষ হলে মাকে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে নামানো হত। মায়েরা-মেয়েরা-পিসিরা-বউরা সবাই দেবীকে বরণ করত। তারপর আটদশজন রুপোর আসাসোঁটা নিয়ে ঢাক-ঢোল-বাজনা বাজিয়ে দুর্গামাকে দশ-বারোজন কাঁধে তুলে দুর্গা মাইকি জয়, আসছে বছর আবার আসবে বলতে-বলতে বাইরের বড়ো পুকুরের দিকে বিসর্জনের জন্য নিয়ে যেত। বাইরের বড়ো পুকুর অনেক লম্বা ছিল, তারও দু-ধারে ছিল দুটো শিবমন্দির। বিসর্জনের সময় বাজনা বেজে উঠত। সবাই

প্রণাম করে বলত আসছে বছর আবার আসবে। মন খুব খারাপ লাগত। অনেকে কেঁদে ফেলত। এখনও চোখে জল এসে যায়।

যারা বিসর্জন দিত তারা হাতে করে জল ছিটাত, ঘটে করে জল নিয়ে যেত। তারপর চণ্ডীদালান পরিস্কার হত। রাতে ছেলেবড়ো সবাই সতরঞ্চি পেতে বসত। ঠাকুরমশাই শান্তিরজল দিত, আর হাতে ফুলবেলপাতা, আলতাপাটির মধ্যে দশটা দুব্বো আর মায়ের ফুল তুলে দিত। সকলে প্রণাম করত।

আমার সতেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল চব্বিশ পরগনায় করঞ্জলি গ্রামের ঘোষদের বাড়িতে। ওখানেও ঘটা করে দুর্গাপুজো হয়। আমার শ্বশুরবাড়িতে আমার দাদাশ্বশুরের আমল থেকে শ্যামরাধারাণীর মন্দির আছে। নিত্যসেবা হয়। দু-বাড়ির দুর্গাপুজোর মিল আছে। তবে আমার বাপের বাড়ি যেমন বোধনের পর ঘট পুজোর ছ-দিন আগে রাখা হয়, এবাড়িতে দশদিন আগে রাখা হয়। আবার ঘট বেলগাছতলায় নয় শ্যামসুন্দরের মন্দিরে রাখা হয়। শ্যামের নিত্যসেবার মতো ঘটেরও রোজ পুজো-আরতি হয়। ষষ্ঠীর দিন ঘট যখন চণ্ডীমণ্ডপের সামনের পুকুর থেকে ডুবিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তখন শ্যামের ঘর থেকেও ঘট নিয়ে গিয়ে মায়ের সামনে বসানো হয়। তাছাড়া মোটামুটি সব এক। ঠাকুরও বড়ো। একজন পুরোহিত আর একজন তন্ত্রধারক থাকেন। বেলপাতা গঙ্গাজল দিয়ে ধুয়ে তার ওপর রক্তচন্দন দিয়ে দুগ্গামার নাম লিখে অঞ্জলি দিতাম। করঞ্জলির বাড়িতেও বলি হয়। পাঁঠাবলি আগে হত। এখনও নাউ-কুমড়োবলি, আখগাছ বলি হয়। আখগাছকে পুকুর থেকে ধুয়ে এনে বলি দেওয়া হয়। এছাড়া কলার বাসনার উপর চাল পিটুলি দিয়ে নরবলির জন্যে

পুতুল তৈরি হত। চারপাশ কাপড় দিয়ে ঢাকা দেবার পর নরবলির জন্যে নির্দিষ্ট খাঁড়া দিয়ে ঠাকুরমশাই সবাইকে বাইরে বের করে বলি দিতেন। বলির সময় বাজনা বাজে, মন্ত্র পড়ার সময় খালি বন্ধ থাকে। শ্বশুরবাড়িতেও দেখেছি বাপের বাড়িতেও দেখেছি, কুমারীপুজো বাড়ির সব থেকে বড়ো সধবা মহিলাই করেন। বাপের বাড়িতে মা বা পরে ভাইয়ের বউ যেমন কুমারী পুজো করতেন, আমার শ্বশুরবাড়িতে আমিও কুমারী পুজো করেছি, এখন আমার বউমা করে।

সৌজন্যে: শ্রীমতী মৃদুলা বসু ও শ্রী জয় মিত্র

গৌরী সেন

আমার ছোটবেলায় দেখা পুজো

নয় নয় করে পেরিয়ে এসেছেন নয়টি দশক। তার স্মৃতির ঝাঁপি ভরে আছে অজস্র ঘটনার পরম্পরায়। দীর্ঘ পথ চলায় কতই-না অভিজ্ঞতা। দেখেছেন মন্বন্তর, ছেচল্লিশের দাঙ্গা। বড়ো হওয়ার পথে পেয়েছেন বিপ্লবী ছোটো মামাকে, গান্ধীবাদী বড়ো মামাকে। স্বাধীনতার প্রথম রাতে শহরজোড়া উন্মাদনার সাক্ষী থেকেছেন। ৬৩ বছর বয়সে বি.এ. পাশ করা মা তাঁর গর্ব, অনুপ্রেরণা। তিনি কথক, গল্প বলেন মনের খুশিতে।

মা

আমার বয়স এখন ৯২। কিন্তু আমার বেশ ছোট বয়সে দেখা পূজোর কথা এখনও বেশ মনে করতে পারি। প্রথমেই বলি আমি জন্মেছিলাম মধ্যবিত্ত পরিবারে। মা, বাবা, আমি আর আমার থেকে ৫ বছরের ছোট ভাই গোবিন—এই ছিল আমাদের সংসার। সংসারে অভাব ছিল, কিন্তু আনন্দের অভাব ছিল না। খুব সুস্থ পরিবেশে বড় হয়েছিলাম। আমরা যে পাড়ায় থাকতাম সেখানে আমার বয়সী অনেক ছেলে মেয়ে থাকত। কাজেই আমার বন্ধুরও অভাব ছিল না। ১, ২, ৩, ৪ করে সংখ্যা গুণতে পারার উপকারিতা বোধহয় প্রথম টের পেলাম, যখন ক্যালেণ্ডারের পাতায় একটা একটা করে দিন গুণে বুঝতে পারলাম পূজোর আর ২ মাস ২৭ দিন বাকী। তারপর ২ মাস ১৩ দিন, ২ মাস ১০ দিন এইভাবে আস্তে আস্তে দিন কমে আসছে আর আমারও

ততই আনন্দ বাড়তে থাকে। তারপর সেই আনন্দ বন্ধুদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়া। কত জল্পনা, কল্পনা। পূজো মানেই নতুন জামা, নতুন জুতো। আমার মনে আছে পূজোর কিছুদিন আগে একদিন রাত্তিরে শুয়েছি, মা বাবা মনে করেছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। শুনতে পেলাম মা বাবাকে বলছে— এবার যখন টানাটানি তখন গৌরীর জন্য এবার আর জুতো কিনতে হবে না। গত বছরের জুতোটা এখনও বেশ ভালোই আছে। বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল— অভাব তোমার আর আমার। গৌরী গোবিনের ত নয়। সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল বাবার জন্য। কিন্তু সেই ছোট বয়সেই বুঝেছিলাম যে আমি যদি নিজে থেকে বলি যে আমার জুতো চাই না তবে বাবা খুব কষ্ট পাবে। তাই মা দুর্গার কাছে অনেক প্রার্থনা করেছিলা— বাবা যেন আমার জুতো না কেনে। আমার সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়নি, সে বছরও আমার জুতো কেনা হয়েছিল। বেশ মনে আছে মা আমাকে আর ভাইকে একটা সাদা কাগজে পা রেখে দাঁড়াতে বলত। তারপর পায়ের চারদিকে পেন্সিল দিয়ে দাগ কেটে পায়ের মাপ এঁকে নিত। সেই কাগজটা বাবাকে দিয়ে দিত। বাবা সেই মাপের সঙ্গে মিলিয়ে জুতো কিনে আনত। এখন কিন্তু নতুন জুতোয় কা'রো পায়ে ফোস্কা পড়ে না। তখন কিন্তু নতুন জুতো পরলেই পায়ে ফোস্কা হোত। মায়েরা বাচ্চাদের নতুন জুতো পরাবার সময় অনেকদিন পর্য্যন্ত জুতোর ভেতর তুলো বা ন্যাকড়া গুঁজে দিত। পূজোর সময় বাচ্চারা নতুন জুতো পরে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঠাকুর দেখতে চলেছে, বা নতুন জুতো হাতে ঝুলিয়ে খালি পায়েই রাস্তা দিয়ে হাঁটছে — এই দৃশ্য কিন্তু তখন খুব দেখা যেত। পূজোর সময় আমার আর ভাইয়ের

একটা করে সিল্কের জামা হোত। মা খুব ভাল সেলাই জানতেন। মার একটা মেসিন ছিল। সিল্কের ছিট কিনে এনে মা নিজেই আমাদের জামা সেলাই করতেন। জুতো বাবা কিনে আনলেও জামার ছিট কিন্তু আমরা সবাই গিয়ে পছন্দ করে কিনতাম। বেশ মনে আছে প্রত্যেকবার একই দোকান থেকে কেনা হতো। ছিট বাড়ীতে এলেই আমার অশান্তি শুরু হোত। কারণ সংসারের কাজ করে মা সময় নষ্ট করতো, আমার জামা আর সেলাই করতে বসে না। রোজই তাগাদা দিতাম। একদিন জামা তৈরী শেষ হোত। তারপর মা সেই জামায় রঙিন সুতোর কাজ করে দিত। মার হাতের কাজ এত ভাল ছিল যে সবাই বলতো যে আমার প্রত্যেকটা জামাই এগজিবিশনে দেওয়ার মত। ভাইয়ের সার্ট বা পাঞ্জাবীও মা তৈরী করতো। একটা জামা পরেই তিনদিন ঠাকুর দেখতে যেতাম। কখনও মনে হয়নি যে তিনদিন তিনটে জামা পরতে হবে। আমাদের পাড়ায় পূজোর সময় পাড়ার দাদারা তিনদিন নাটক করতো। অনেকদিন আগে থেকেই তার রিহার্সেল চলতো। পাড়ার একটা বাড়ীর বৈঠকখানায় রিহার্সেল হোত। আমরা দল বেঁধে জানালার আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে রিহার্সেল শুনতে যেতাম। তার একটা কারণ ছিল যে দাদারাই নাটকে মেয়ে সাজত। কিন্তু নাটকের দিন যখন সেজেগুজে স্টেজে উঠবে তখন ত আর কাউকে আমরা চিনতে পারব না। কাজেই রিহার্সাল শুনে আগে থেকেই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করা যে কোন কোন দাদা মেয়ে সাজবে। দাদারা টের পেলে আমাদের মাঝে মাঝে তাড়া করতো। দল বেঁধে আমরা দৌড়ে পালাতাম। সেই পালানোতেও কী আনন্দ। তারপর এসে গেল মহালয়া।

মহালয়া মানেই পূজো শুরু হয়ে গেল। আমাদের পাড়ায় তখন একটা বাড়ীতেই রেডিও ছিল। তারা মহালয়ার দিন ভোরে রেডিওটা খুব জোরে চালিয়ে দিত—যাতে পাড়ার সবাই শুনতে পায়। আগের দিন রাত্তিরে মাকে বলে রাখতাম যেন ভোরবেলা ডেকে দেয়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে মহালয়া শুনতাম—কি যে ভাল লাগতো। পরদিন সকাল হলেই বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে দৌড়তাম। কে কে মহালয়া সবটা শুনেছে। সবাই বলতো—সবটা শুনেছি। আমার খুব মন খারাপ হয়ে যেত। আমি যে আবার মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছি। তারপর নিজেকে সান্ত্বনা দিতাম—ওরা নিশ্চয় বাজে কথা বলছে, না হয় আমার মত মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়েছে, সেটা নিজেরাও টের পায়নি। আমাদের পাড়ায় পূজোটা আমাদের বাড়ীর খুব কাছেই হোত। পাড়ায় সবাই সবাইকে চিনত। আর অভিভাবকেরও অভাব ছিল না। কেউ না কেউ মণ্ডপে সব সময়েই থাকত বাচ্চাদের ওপর নজরদারি করার জন্য। তাই মায়েদের কাছে সহজেই অনুমতি পাওয়া যেত বন্ধুদের সঙ্গে মণ্ডপে যাওয়ার। পূজোর কটা দিন সকাল থেকে বন্ধুরা সবাই মিলে মণ্ডপেই থাকতাম, বেলা বাড়লে কোন জেঠু বা কাকু বাচ্চাদের সব বাড়ী পাঠিয়ে দিত। স্নান সেরে আবার অঞ্জলি দিতে যেতাম।

বিকেলে সেজেগুজে মা, বাবা আর ভাইয়ের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে যাওয়া। এখনকার তুলনায় তখন পূজোর সংখ্যা অনেক কম ছিল। কিছু সার্বজনীন আর কিছু ধনী লোকের বাড়ীর পূজো। জাঁকজমকও ছিল না এত। কিন্তু আনন্দ কিছু কম ছিল না। এখন যেমন দু-পা হাঁটলেই অনেক প্যাণ্ডেল দেখা হয়ে যায়, তখন

এক মণ্ডপ থেকে আরেকটায় যেতে হলে পায়ে ব্যথা হয়ে যেত। আমরা তাই তিনদিন ঠাকুর দেখাও ভাগ করে নিতাম—কবে কোথায় যাব। তবে প্রতি বছরই যে কোন একদিন একটা বাড়ীতে সন্ধেবেলা আরতি দেখতে যেতাম। বাড়ীটা কোথায় ছিল এখন আর মনে করতে পারি না—সবাই বলত বেনেবাড়ী। বাড়ীটা খুব বড় ছিল, আর বাড়ীতে অনেক লোক। সন্ধেবেলা বাড়ীর লোকেরা সবাই ঠাকুর দালানে জড় হোত। বাড়ীর সব ছেলে আর কর্ত্তাদের পরণে থাকত রঙিন, সিল্কের জরিপাড় ধুতি আর চাদর আর গলায় লম্বা সোনার হার। মেয়েরা, বৌয়েরা এমনকি বয়স্ক গিন্নিরাও সবাই রঙিন, ঝলমলে বেনারসী আর গা ভর্তি সোনার গয়না পরতো। এত গয়না জীবনেও দেখিনি। অবাক হয়ে দেখতাম। আরতির সময় বাড়ীর কর্ত্তারা সারাক্ষণ সাদা ধবধবে চামর দোলাত। ঠাকুর দেখার চাইতে বাড়ীর লোকেদেরই ভাল করে দেখতাম। তবে আমরা খুব বেশী রাত পর্যন্ত ঠাকুর দেখতাম না। বাড়ী এসে খাওয়া দাওয়া করে পাড়ার নাটক দেখতে যেতাম—মা'র সঙ্গে। তিনদিনই রাত জেগে নাটক দেখতাম। মণ্ডপের পাশেই স্টেজ তৈরী হতো। সামনে বড় বড় শতরঞ্চি আর সাদা চাদর পেতে বসার জায়গা হোত। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাচ্চা শতরঞ্চির ওপর শুয়েই ঘুমিয়ে পড়তো। তাদের মায়েরা খুব সতর্ক থাকত যাতে আসর ছেড়ে ওঠবার সময় কেউ আবার বাচ্চাকে মাড়িয়ে না দেয়। আমিও কিন্তু তখন নাটক সব বুঝতাম না। কিন্তু মহা উৎসাহে পর পর তিনদিন রাত জেগে বসে থাকতাম—কোনদিন ঘুমিয়ে পড়িনি। ভোর রাত্তিরে বাড়ী এসে শুয়ে পড়তাম। শুয়ে শুয়ে শুনতাম নাটক দেখে সবাই দলে

দলে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে বাড়ী ফিরছে। তাদের সেই হাসি, গল্পের আওয়াজ আর পায়ের শব্দ আমাদের বাড়ীর কাছে এসে স্পষ্ট হচ্ছে, আবার আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। দলের পর দল যাচ্ছে—সেই মিলিয়ে যাওয়া আওয়াজ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম। সে সব কথা মনে করে এখনও আনন্দ পাই। তিনটে দিন বড় তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেত। বিজয়ার দিন কান্না পেত—আবার এক বছর অপেক্ষা করতে হবে।

এখন আমরা যে আবাসনে থাকি সেখানেও খুব জাঁকজমক করে পূজো হয়। তিনদিন একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া, নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—সবাই মিলে খুব আনন্দে কাটাই। কিন্তু এ বছর পূজো—জানি না। মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি—আমরা যেন খুব তাড়াতাড়ি আবার সুদিন ফিরে পাই। ছোট, বড়, গরিব, বড়লোক কেউ যেন পূজোর আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়।

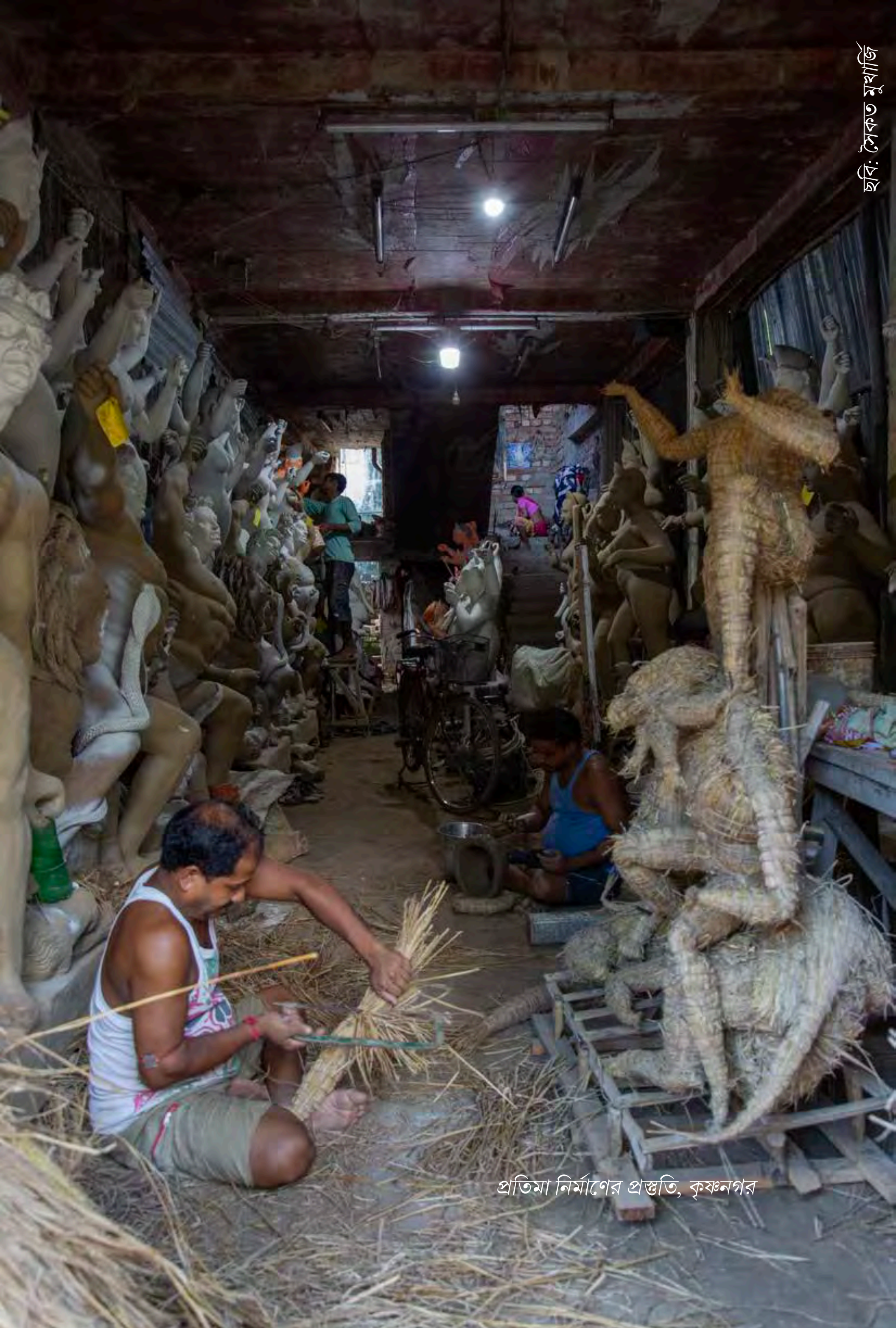

প্রতিমা নির্মাণের প্রস্তুতি, কৃষ্ণনগর

ছবি: সৈকত মুখার্জি

সতী দাশগুপ্ত

বেলতলীতে কয়েকবার দুর্গোৎসব

সতী দাশগুপ্তের জন্ম ১৯৩৩-এ। বিনোদিনী গার্লস হাই স্কুল, ঢাকুরিয়া মুরলীধর গার্লস কলেজ-এ পাঠ শেষে যোগ দেন রেলের চাকুরিতে। বিবাহসূত্রে তিনি হাওড়ার বাসিন্দা। হেড ক্লার্ক, অপারেটিং অ্যাকাউন্টস হিসেবে তিনি কর্মজীবন শেষ করেছেন।

মা

ছোটবেলার পুজো বলতে দেশের পুজোর কথাই মনে পড়ে। পুজোর সময়ে ঢাকুরিয়ার বাসায় থাকতাম না। বাবার সঙ্গে দেশে যেতাম প্রতি বছর। মহালয়ার সময় দিয়ে। তবে মহালয়ার আগে না পরে, সেটা মনে নেই। সঙ্গে মা যেতেন। আর ভাই খোকন। অন্য ভাইরা তখনও জন্মায়নি। সেই সময়ে আমার বয়স সাত-আট। অত দিনের কথা তো, তাই বেশি কিছু মনে পড়ে না। বাড়ি থেকে যেতে হত শিয়ালদা স্টেশনে। সেখান থেকে ট্রেনে গোয়ালন্দ।

গোয়ালন্দ বললেই যে তোমরা খাবারের কথা বল, আমার কিন্তু সেই সবের কোনও আন্দাজ নেই। বাবা বাইরে খাওয়া পছন্দ করতেন না। সঙ্গে নিয়ে আসা খাবার ট্রেনে, স্টিমারে বা নৌকায় সুযোগ মতো খেয়ে নিতাম আমরা। একবারই বোধহয় গোয়ালন্দে ভাত খেয়েছিলাম। তবে তার সঙ্গে কী

খেয়েছিলাম, সে-সব আর মনে নেই। তেমন বলার মতো কিছু বোধহয় খাইনি।

আমাদের দেশের বাড়ি ছিল ঢাকা জেলার বেলতলী গ্রামে। গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে যেতে হত হত তারপাশা বা ভাটবকুল ঘাটে। সেখানে বাড়ির নৌকা আসত। সেই নৌকায় গিয়ে পৌঁছতাম বেলতলী। নদীর ঘাট থেকে বাড়ি বেশি দূরে ছিল না। আমার বাপের বাড়ির পদবী মজুমদার লিখলেও আমাদের বাড়িকে বলা হত 'ধরের বাড়ি'। আমাদের আসল পদবী ছিল 'ধরগুপ্ত', তাই। বাড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয়, দক্ষিণপাড়ায় ছিল বাবার মামার বাড়ি।

আমাদের বেলতলীর বাড়িতে দুর্গাপুজো হত। বাড়ির মাঝখানে ছিল উঠোন। তাকে ঘিরে চারদিকে ঘর। আমরা বলতাম উত্তরের ঘর, দক্ষিণের ঘর, পুবের ঘর আর পশ্চিমের ঘর। পুজো হত বাইরবেরি-তে। মানে বাইরের বাড়ি। দক্ষিণের ঘরের সামনের দিকে, দক্ষিণমুখো মণ্ডপ ছিল। গ্রামের কুমার সেখানে ঠাকুর বানানো শুরু করে দিত আমরা এসে পৌঁছনোর আগে থাকতেই। দেশের বাড়িতে এমনিতে কেউ থাকত না। বাবা মাঝে মাঝে আসতেন কলকাতা থেকে। পুজোর সময়ে মুক্তাগাছা থেকে জেঠিমা আর জেঠতুতো ভাইবোনেরা কেউ না কেউ আসত। এমনিতে বাড়ি দেখাশোনার দায়িত্ব ছিল দাগুদা-র উপর। দাগু-র বয়স তখন অনেক। সে আর তার বউ থাকত আমাদের বাড়ির কেয়ারটেকার হয়ে। বাবা এসে পৌঁছনোর আগে ঠাকুর তৈরি করানোর কুমার নিয়ে এসে পুজোর আয়োজন দাগুদাই শুরু করত।

দাগুদার ভালো নাম মনে নেই। হয়তো শুনিইনি কখনও। তবে তার আর তার বউয়ের চেহারা মনে আছে। শুনেছিলাম দাগুদা পিওনের কাজ করত। পোস্ট অফিসের পিওন। তখনই রিটায়ার করে গিয়েছিল। ওদের পদবীও মনে নেই। তবে শুনেছিলাম ওরা নাকি তেলি।

আমাদের বাড়ির ঠাকুর হত একই কাঠামোর মধ্যে। একচালা। মা দুর্গাকে বেনারসী শাড়ি পরানো হত। তার নীচে পরানো থাকত লাল শালু। বিসর্জনের আগে শাড়িটি খুলে নিয়ে তুলে রাখা হত পরের বছর ব্যবহারের জন্য। একই শাড়ি প্রতিবার পরানো হতে দেখতাম। গ্রামের ঠাকুরমশাই পুজো করতেন। কাঁচা তরকারি ধুয়ে ভোগ হিসেবে ঠাকুরকে নিবেদন করা হত। আমরা তো ব্রাহ্মণ নই, বৈদ্য। তাই ভোগ রান্না করা হত না আমাদের বাড়িতে। পুজোর পর প্রসাদী সব্জি কেটে-কুটে ধুয়ে বাড়ির রান্নার মতো রান্না করে খাওয়া হত।

দুটো পুকুর ছিল আমাদের বাড়িতে। একটা বাইরবেরির পুকুর। অন্যটা হল গিয়ে পাছদুয়ারের পুকুর। স্নানটানের জন্য পাছদুয়ারের পুকুর ব্যবহার করতাম আমরা। ঠাকুর বিসর্জন হত বাইরবেরির পুকুরে।

বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোও হত বেশ ধূমধাম করে। তবে মণ্ডপে নয়। উত্তরের বড় শোওয়ার ঘরে। প্রায় আড়াই-তিন হাত উঁচু ঠাকুর। আলাদা করে নিয়ে আসা হত, নাকি ওই কুমারই বানাত, তা আর মনে নেই। লক্ষ্মীপুজো মিটিয়ে দেশের বাড়ি ছেড়ে কলকাতার বাসায় ফেরা হত। কলকাতার বাড়িতে অন্য জ্যাঠামশাই, জেঠিমা, দাদা, দিদিরা সকলে একসঙ্গে থাকতাম।

কিন্তু পুজোর সময়ে দেশে যেতে বাবার সঙ্গী হতাম মা, আমি আর খোকন। দিদি, রাঙাদি, ছোড়দি এরা কেউ বোধহয় দেশে যায়নি একবারও। জ্যাঠামশাইরাও খুব একটা যেতেন না। বাবা কিন্তু প্রায়ই দেশে যেতেন। তাঁর বোধহয় দেশের প্রতি টানটা একটু বেশিই ছিল। ছিল বলেই আমারও বারকতক দেশের বাড়িতে গিয়ে পুজো দেখা হয়ে গিয়েছিল।

এর কয়েকবছর পর তো দেশ বলেই আর কিছু রইল না। বিদেশ হয়ে গেল দেশটা!

মণ্ডপনির্মাণের প্রস্তুতি, রানাঘাট

ছবি: সৈকত মুখার্জি

কৃষ্ণা কুন্ডু

অশীতিপরার দুর্গাদর্শন

কৃষ্ণা কুণ্ডুর জন্ম হাওড়ায় ১৯৩৬-এ। তিনি কর্মজীবনে রামমোহন কলেজ-এর ইতিহাসের অধ্যাপিকা ছিলেন।

মা

দুর্গাপূজা মানেই ছিল, মহালয়ার ঊষাকালে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের “মহিষাসুর-মর্দিনী” স্তোত্র পাঠ শোনা, পাঠ শেষ হলে উঠে পড়ে মুখ-হাত ধুয়ে প্রায় ছুটতে ছুটতে বাজে শিবপুর রোডের শরৎ মুখার্জী মশায়ের বাড়ীতে প্রতিমা তৈরী দেখতে যাওয়া। পুজোর দিনে সকাল বিকাল ঠাকুর দেখা, আরও ছিল নতুন জামা-কাপড়, ঢাকের বাজনা, কাশফুল, শিউলিফুল আর বেডিং, ওয়াটার-বটল নিয়ে বাবা-মায়ের সঙ্গে ‘পশ্চিমে’ (সাধারণতঃ তৎকালীন সাঁওতাল পরগণায় বিহারের নানা জায়গায়) বা পুরীতে বেড়াতে যাওয়া। কয়েকখানাই বা পুজো হত, একই ঠাকুর বারবার দেখেই আমাদের আনন্দ ছিল। — এ হল আমাদের ছোটবেলার কথা।

আমি জন্মেছি শিবপুরের ধর্মতলা লেনে। শ্বশুরবাড়ির সুবাদে এখনও এইখানেই আমার ও আমার পরিবারের বাস। এ অঞ্চল

এখন ভোটের শিবপুর কনস্টিটিউয়েন্সির অন্তর্গত নয় বটে, তবে শিবপুর বলতে এই স্থানই বোঝায়। ধর্মতলা লেনের শুরু শিবপুর বাজার এলাকার শিবপুর রোডের রাধাকৃষ্ণ মন্দির থেকে। এর ওপারেই ধর্ম ঠাকুরের 'থান' (স্থান)। এখন মন্দির। এই ঠাকুরের নামেই আমাদের রাস্তার নামকরণ। মন্দির থেকে পথটি সোজা উত্তর মুখে এসে আমাদের বাড়ির (পিত্রালয়, ৪৫নং বাড়ি) সামনে থেকে দু'ভাগ হয়ে মিলেছে একই বাজেশিবপুর রোডে। ডানদিকটা ধর্মতলা লেনই আর বাঁদিকের রাস্তা নীলকমল চক্রবর্তী লেন। মোটামুটিভাবে এই এলাকা বাজেশিবপুর নামেই পরিচিত। না, এ নামে নাসিকাকুঞ্চনের প্রশ্ন নেই। 'বাজে' শব্দটি এখানে 'বাদে' শব্দের অপভ্রংশ রূপ। জমি-জরিপের সময়ে যে জমির হিসাব পাওয়া যেত না, তাকে 'বাদে' অর্থাৎ উদ্বৃত্ত জমি বলা হত। রাণী ভবানীর কন্যা তারাসুন্দরীর অধীনের 'বাদে' পরগণা ছিল। আমার ছোটবেলা আর বড়বেলা এখানকার পুজো দেখেই কেটেছে আর কাটছে। এ কারণে এখানকার কথাই আগে লিখতে হবে।

মজার কথা হল ধর্মতলা লেনে, তখন একটিও পুজো হত না। শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মশায়ের বাড়িতে প্রায় ১৪০ বৎসর ধরে পুজো হচ্ছে, ক্ষুদিরাম মুখোপাধ্যায় এই পুজো শুরু করেন। জানালেন পরিবারের সদস্য সমর মুখোপাধ্যায়। আগে ঠাকুর দালান ছিল, এখন ফ্ল্যাট হয়ে যাওয়ায় একটি ঠাকুর ঘর তৈরী করা হয়েছে। গত বছরও ওখানে গেছি। ওরা খুবই সমাদর করেন আমাকে।

বাজে শিবপুর রোড থেকে রামকৃষ্ণপুর লেনে ঢুকতেই পতিতপাবন চক্রবর্তীর বাড়ির পুজো ছিল একটি প্রাচীন পুজো,

মাঝে হীরেন চ্যাটার্জীর মশায়ের বাড়িতে নাকি এই পুজো চলে যায়, শুনেছিলাম এই রকম। পরে পুজোর দায়িত্ব নেয় সুহৃদ সংঘ ১৯৪৩ সালে, এটি অবশ্য এখন বারোয়ারী পুজো, পুজো হয় প্রয়াত সুশীল ঘোষ মশায়দের মাঠে।

এখানকার প্রাচীনতম পুজো এখনও সাড়ম্বর অনুষ্ঠিত হয় নবগোপাল মুখার্জী লেনের পালবাড়িতে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী বটকৃষ্ণ পালের পৈত্রিক বাড়ি এটি। বাড়ির সদস্য অমিত পাল জানালেন যে, প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন এই পুজো প্রথম করেন সর্বস্য পাল। বটকৃষ্ণ পালও এই পুজো করতেন। এখানে মা দুর্গার অভয়া রূপ, মা বরদা মুদ্রায় ডান হাতটি তুলে রেখেছেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর চার সন্তান তো আছেনই। স্বামী শিবকেও নিয়ে এসেছেন তিনি পিত্রালয়ে। মহিষাসুর এখানে অনুপস্থিত রোজ এখানে ছাগবলি হয়, নবমীতে মহিষ। ঠাকুর দেখতে যেতাম কিন্তু সন্ধ্যাতেও কটুগন্ধে থাকা যেত না। ছোট দাদারা যেতেন না বলি হয় বলে, বাবা ছিলেন অহিংসার পূজারী।

বাবার বন্ধুস্থানীয় হরিচরণ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ির পুজোয় গেছি বাবার সঙ্গে, প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লেনে। মন্দিরতলায় হরি ভট্টাচার্যের বাড়ির পুজো এখন বন্ধ হয়ে গেছে, মুখার্জী বাড়িতেও পুজো হত।

রামকৃষ্ণপুরের তারাপদ বসুর বাড়ির ঠাকুরদালানে দুর্গা পুজো হয়। আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতেও কয়েক বছর পুজো হয়েছে, ওদের বাড়ি শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কাছে। আমি অবশ্য কোনদিন যাইনি।

১৯৪০ সালে বারোয়ারী পুজো শুরু হয় বেণী মিত্র লেনের মাঠে। আমাদের পাড়ার ভূপতিদা (ভূপতি বসু) নিজে ঠাকুর গড়তেন। এখন যে ‘থীম’ পুজোর জয়জয়কার, বলা যায় এই পুজোও ছিল থীমের পুজো। এখানে অবশ্য থীম পৌরাণিক। যে দেবীশক্তিরা দুর্গামাকে দুর্গতিদমনে সাহায্য করেছিলেন তাঁরা অর্থাৎ ব্রহ্মাণী, শিবানী, চামুণ্ডা, ইন্দ্রানী, নরসিংহ, বারাহী, কৌমারী আর নারায়ণী দেবী দুর্গাকে কেন্দ্রে রেখে মণ্ডলাকারে পর্বতগাত্রে দাঁড়িয়েছেন। মায়ের ‘সরলচণ্ডী’ বইখানা আমার প্রায় মুখস্থ ছিল। কতজনকে যে এঁদের পরিচয় দিয়েছি। এখন নাতনি-নাতিদের বলি। এখানে সিঁদুর খেলায় দিদি যেতেন, সঙ্গী আমি। এই পুজোই শিবপুর সাধারণ দুর্গোৎসব। বাঘের ডাঙ্গা মাঠে হয় এই পুজো।

প্রসঙ্গত বলি, কলাবউ যে মা দুর্গার প্রতীকীরূপ নবপত্রিকা-এ তথ্যও জানা ছিল, গণেশের বউ বলে তাঁকে পরিচিত করা ভুল। নব পত্রিকার পত্রগুলির নাম মনে ছিল না অমিত পালের কাছ থেকে জেনে নিলাম। একটি সপত্র কলাগাছের সঙ্গে অপর আটটি সপত্র উদ্ভিদ—কচু, হলুদ, জয়ন্তী, রিড, ডালিম, অশোক, মানকচু ও ধান—অপরাজিতা লতা দিয়ে বেঁধে লালপাড় শাড়ি জড়িয়ে দেওয়া হয়। ঘোমটাও দেওয়া হয়। এখন কলাগাছ ছাড়া অন্যান্য গাছের পাতাই দেওয়া হয়।

দুর্গাপুজোয় লাগে অপরাজিতা ফুল ও পদ্ম, (নীলপদ্ম বিশেষত)।

নীলপদ্মের কথায় বাজেশিবপুর ফ্রেণ্ডস্ ক্লাবের অকালবোধনের পুজোর কথা আসবেই। এখানে দেবীর পুজোয়

রত রামচন্দ্র নিজের নীলচক্ষু উৎপাটিত করতে, উদ্যত, সঙ্গে আছেন হনুমান ও বিভীষণ। এক থীম।

চৌধুরী পুকুরের পাড়ে সাঁজার আটচালাতেও বারোয়ারী পুজো হত, বলি হত।

এই সব পুজো মণ্ডপে বারবারই ঘুরে বেড়িয়ে ঠাকুর দেখা চলতো ছোটদের, অর্থাৎ আমাদের। পুজোর জামা-কাপড় নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। একই ঠাকুর বারবার দেখাতেই আনন্দ। বড়রাও ঠাকুর দেখতেন সন্ধ্যায়, সকালে পুজো আর অঞ্জলি দেওয়া।

বোধহয় ক্লাশ এইটে পড়ি তখন। ন'দা (মোহন দাশগুপ্ত একজন ক্লাব সংগঠক ও বক্সার)—বললেন, 'চল, পুজো মণ্ডপে ভলান্টিয়ার হতে হবে। প্রাণকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লেনে'।

সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়দের বাড়ির মাঠে পুজো। (তখন তিনি বালক, জজসাহেব হননি অবশ্য)। আমি তো এসব ব্যাপারে এক কথায় রাজি। দড়ি দিয়ে রাস্তা দু'ভাগ করা থাকতো—একপাশ দিয়ে মহিলারা, অন্যপথ দিয়ে পুরুষরা মণ্ডপে প্রবেশ করতেন। তাদের সুবিধা করে দেওয়া, হারিয়ে গেলে খুঁজে দেওয়া, জল দেওয়া ইত্যাদি ছিল ভলান্টিয়ারদের কাজ। কতই বা ভিড় হত। তবু সুব্যবস্থা ছিল। আমাদের তরুণ সংঘের ছেলেরা অষ্টমীর দিন ওখানে "বীরাষ্টমী" পালন করলেন, ব্যায়াম প্রদর্শনী করে। খুবই মনোগ্রাহী হয়েছিল অনুষ্ঠানটি। অধিনায়ক ছিলেন সেজদাদা সত্যজিৎ। এখন এ পুজো বন্ধ হয়ে গেছে।

তেমনই পুজোর সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘড়িওয়ালা মাঠের পুজো, সাধুবাবার পুজো, সংগঠনী সংঘ, মিতালি সংঘ, ভ্রাতৃপ্রেম

সংঘের পুজো, মন্দিরতলা চারাবাগানের পুজো, শিবতলায় শিব মন্দিরের নাট মন্দিরের পুজো শুরু হয় আমার ছাত্র জীবনে। এখন মহিলারা এই পুজো পরিচালনা করেন। ধর্মতলা লেনেই এখন তিনখানা পুজো। আরও অনেক পুজো হচ্ছে এখন।

পুজোর সময় নতুন জামাকাপড়, জুতো অবশ্যই হত। দামী ফ্রক এক দুবার পেয়েছি। পরে শাড়ি। লিপস্টিক, রুজের ব্যবস্থা ছিল না। একান্নবর্তী পরিবারে সকলের জন্য একরকম ব্যবস্থা। এখন তো খবরের কাগজে, টিভিতে বিরাট ভোজের বর্ণনা দেখি—বাড়ির ভোজ, রেঁস্তোরার ভোজ। এসব বড় একটা শুনিনি ছোটবেলায়। কিন্তু ঐ কদিন ভালমন্দ খাওয়া দাওয়া হতই। আমরা আদিতে পূর্ববঙ্গের লোক, অষ্টমীতে পাঁঠার মাংস আর বিজয়ার দিনে ইলিশ মাছের ব্যবস্থা ছিল।

বিজয়ার সন্ধ্যায় বড়দের প্রণাম করা অবশ্য কর্তব্য ছিল, এখনও আছে। ছোটবেলায় পাড়ার বাড়িতে বাড়িতেও প্রণাম করতে যেতে হত, না গেলে ওঁরা ক্ষুণ্ণ হতেন, এখন এ রীতি চলছে কি? অবশ্য মোবাইল সব লগ্নেই wish করে।

দুর্গোৎসবের আনুষঙ্গিক ছিল বিচিত্রানুষ্ঠান। শিবপুরে এই জলসা খুব নাম করেছিল। এখনও এই রকম অনুষ্ঠান হয়। অনেক সুগায়ক ছিলেন শিবপুরে, এখানকার "কলকাকলি" নামের অর্কেষ্ট্রার দল বাংলার এক প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। কি সুন্দর বাজনা ছিল, আমার সৌভাগ্য যে আমি এই বাজনা শুনেছি। বাণীসমাজ, বাণী মন্দির ক্লাবের সদস্যরা যাত্রা করতেন। মধ্যহাওড়ার "হাওড়া সমাজের তো ভারতজোড়া নাম ছিল। ওখানকার এক প্রাণপুরুষ হৃষিকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় শিবপুরের বাসিন্দা ছিলেন।

আর একটি স্মৃতি, একবার দুর্গোৎসবের সমসময়ে ঈদের দিন পড়েছিল। তার কিছু আগে সাম্প্রদায়িক গোলমাল হয়েছিল। পুজোর পরে মূলতঃ বামপন্থীদের উদ্যোগে ঈদ-বিজয়া সম্মেলন হয়েছিল। সম্প্রীতি মিছিল হয়েছিল, যা আমি দেখেছি।

দুর্গোৎসব আমাদের ধর্ম নির্বিশেষে সর্বজনীন মিলনোৎসব। সারা বছরের ক্লান্তি, যন্ত্রণা দূরে সরিয়ে আমরা এই আনন্দ উৎসবে মিলিত হই। এ আমাদের সব পেয়েছির আসর।

আগে বলার কথা শেষে বলি। ছোটবেলায় মায়ের কাছে শুনেছি তাঁর বাপের বাড়ি, জৈনসারের (অধুনা বাংলাদেশ) পুজোর সব গল্প। ওঁরা ছিলেন প্রায় জমিদারের মত। বেশ কয়েকদিন আগে থেকে নারকেল পাড়ানো, চিড়ের ধান তৈরি করা, মুড়ি ভাজা ইত্যাদি কাজ শুরু হত। দেবী প্রতিমা অবশ্যই একচালা। নারকেল নাড়ু, সন্দেশ, চিড়ে মুড়ির মোয়া, তিলের নাড়ু, বাড়ির মেয়েরাই তৈরি করতেন। গ্রামের সকলেই ছিল এই পুজোর অংশীদার। মায়ের চোখ ভিজে যেত গল্প বলতে বলতে।

আজ এই ভয়াবহ অসুস্থতার দুর্যোগে দেবী দুর্গা আসুন, অশুভ শক্তিকে পরাভূত করতে, দমন করতে, বিনাশ করতে। আনন্দময়ী সকলকে আনন্দ প্রদান করুন।

“দেবি প্রপন্নার্তিহরে প্রসীদ ”

নমিতা চক্রবর্তী

শরতের দুর্গা নয় বসন্তের বাসন্তী আমাদের মা

নমিতা চক্রবর্তীর জন্ম ১৩৪০ বঙ্গাব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়ার উনশিয়া গ্রামে। পরবর্তীকালে তাঁরা কলকাতায় বসবাস শুরু করেন। বিবাহ পরবর্তী সময়ে তিনি চন্দননগরের বাসিন্দা।

মা

আমার জন্ম বাংলা ১৩৪০ সালে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালীপাড়ার ঊনশিয়া গ্রামে। বাবার কাছে শুনেছিলাম বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ এই গ্রামেই জন্মেছিলেন। লোকে তাই গ্রামটাকে পণ্ডিতের গ্রাম বলতো, অন্তত আমাদের খুব ছোটবেলাতেও সেরকম শুনেছি।

আমার বয়স যখন নয় কি দশ এবং দাদার বয়স বারো আর আমার পরে আরো দুই ছোট ছোট ভাই, তখনই বাবা আমাদের নিয়ে কলকাতায় চলে আসেন কাজের সন্ধান করে। ফলে ঊনশিয়ার কথা খুব অল্পই মনে আছে, তবু যেটুকু মনে আছে তার থেকেই দু-চার কথা বলব।

তখনকার পাকিস্তানে আমাদের গ্রামটি যে খুব বড় ছিল এমন বলা যাবে না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ত্রিশ থেকে চল্লিশটির মত

বাড়ি ছিল মনে আছে। পাকা বাড়ি অর্থাৎ ইটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরি একতলা বাড়ির সংখ্যা হাতেগোনা দু-চারটি। বাকি সব বাড়িতেই, যেটুকু মনে আছে, মাটির মেঝে দরমার বেড়া, খড় কিংবা টিনের চাল, বাঁশ অথবা শাল কাঠের খুঁটি। যাদের যেমন জমি জায়গা ছিল তারা সেই রকম বাড়ি বানাত। গ্রামের মধ্যে দু'চারটে পাড়া ছিল। সেই পাড়া গুলিতে বেশিরভাগই ব্রাহ্মণ পরিবারের বসবাস ছিল। পূজাআচ্ছা এবং যজমানি ছিল প্রধান জীবিকা। এছাড়া প্রায় প্রত্যেকেরই চাষের জমি এবং পুকুর ছিল। যেখান থেকে খাবার বন্দোবস্ত হয়ে যেত। আর ছিল বাড়ির ভিতরে আম জাম কাঁঠাল খেজুর এসব সুস্বাদু ফলের গাছ। যাদের অবস্থা একটু ভালো ছিল তাদের বাড়ির ভিতরে টিউবওয়েল ছিল। তাদের সেই জলে রান্না খাবার কাজ সারা হত। বাকিদের ছিল বাড়ির সঙ্গে টলটলে জলের পুকুর, তারা সেই পুকুরের জলেই রান্না খাবার কাজ করতো। আবার কয়েকটি কচুরিপানা ভর্তি পুকুর ছিল, সেই পুকুরের জল কেউ ব্যবহার করত না। আর ছিল পুকুরের পাড়ে বড় বড় বাঁশ গাছ।

আমাদের পরিবারটি ছিল বেশ বড়। বাবা-মা আমরা চার ভাই বোন এবং জ্যাঠামশাইদের চার মেয়ে ও জ্যাঠাইমা জ্যাঠামশাই। আর ছিলেন বিধবা ঠাকুমা। মূলত তার শাসনে আমরা বড় হয়েছি, তার হাত ধরেই ছিল বাড়ীর বাইরে পা রাখা।

পুজো মানে এখনকার মতো ছিল না, ছিল একটা অন্য ধরনের আনন্দ। তবে শরতের দুর্গা নয় বসন্তের বাসন্তী আমাদের মা। এখনকার মত বারোয়ারি পুজোর প্রচলন ছিল না গ্রামে। তবে অনেকের বাড়িতেই তিনদিন ধরে

পূজো হতো, সেই সঙ্গে ছিল পাঁঠাবলির ব্যবস্থা। পূজার দিনগুলো গোটা গ্রাম আনন্দে মেতে থাকতো। প্রত্যেকের বাড়িতেই পূজা উপলক্ষ্যে খাওয়া-দাওয়া অন্যরকম হতো। এছাড়া প্রায় সকলেই পুজোবাড়িতে নিমন্ত্রিত হতেন। যেটুকু মনে আছে পুজোর আগে বাবা আমাদের ভাই-বোনদের জন্য নতুন পোষাক নিয়ে আসতেন। যদিও আমরা অবস্থাপন্ন পরিবারের সদস্য ছিলাম না তবু যেটুকু পেতাম সেটাই ছিল পরম আনন্দের।

ঠাকুরমা ছিলেন আমাদের ঠাকুর দেখানোর অভিভাবক। আমার বাবার একমাত্র মেয়ে হলেও ছোটবেলায় আমি খুব শান্ত স্বভাবের ছিলাম বলে ঠাকুরমার কাছে খুব প্রিয় ছিলাম। আমাদের গ্রামের আর এক প্রান্তে ছিল ঠাকুর মার বাপের বাড়ি। সেখানে খুব বড় আকারে দুর্গাপুজো হত। পাকা দেওয়ালের ঠাকুরদালানে অনেকদিন আগে থেকে কুমোর এসে খড়মাটি দিয়ে প্রতিমা তৈরি করত। তারপর একটু একটু করে চোখ কান নাক এসব ফুটিয়ে তুলত। বাবার মামার বাড়ি বলে সেখানে আমরা একটু অতিরিক্ত আদর পেতাম। পুজোর অনেক আগে থেকেই ঠাকুরমা আমার হাত ধরে সেই প্রতিমা তৈরি দেখতে নিয়ে যেতেন।

পূজার দিনগুলি আমাদের সপরিবার নিমন্ত্রণ থাকত ওই পরিবারে। মনে পড়ে পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ, বাড়ির মহিলাদের পূজার আয়োজন, উঠোনের আরেকপ্রান্তে রান্নার আয়োজন। অনেক লোকের রান্না হত পুজোর দিনগুলোতে। সারাদিন হই হট্টগোলের মধ্যে দিয়ে কিভাবে সন্ধ্যা নেমে আসতো বোঝা যেত না। সন্ধ্যার পর বড় বড় হ্যাজাক এবং গ্যাসের আলো জেলে দেওয়া হতো ঠাকুরদালানে। যতদূর মনে পড়ে একবার ওই বাড়িতে

অনেক রাত পর্যন্ত পূজা উপলক্ষে যাত্রা হয়েছিল। পুরাণের কোনো কাহিনী নিয়ে ছিল সেই পালা। এর বেশি আর মনে নেই।

এইভাবে তিন দিন গৃহস্থের ঘর আলো করে দশমীতে মা বিদায় নিতেন। সকালের পূজা শেষ হলে দুপুরের মধ্যেই মাকে বিদায় জানানো হতো। সধবারা সিঁদুর বিনিময় করতেন পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করে।

কলকাতায় আসার পর ক্রমশ আমার স্মৃতি থেকে একটু একটু করে বিদায় নিল সেই শান্ত গ্রাম সেই সব নদী মাঠ ধানক্ষেতের মৌরলা, সেইসব মানুষ জন এবং সবার উপরে বসন্তের সেই মা। তার জায়গায় চোখের সামনে আসতে আসতে বেড়ে উঠলো বড় বড় বাড়ি চওড়া রাস্তা ঘাট ট্রাম বাস মানুষে টানা রিক্সা কোলাহলপূর্ণ এক ব্যস্ত শহর। ক্রমশ হারিয়ে গেলেন হ্যাজাকের আলোয় চৈত্রের নবমীর রাতে চোখের কোন চিকচিক করে ওঠা এক নিঃসঙ্গ মায়ের মুখ। তার বদলে উঠে এলো শরতের শিশির ভেজা দিনগুলিতে পাড়ায় পাড়ায় প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে অগণিত মানুষের ভিড়ে আর এক মায়ের মুখ— শরতের শারদীয়া। হয়তো এক মায়ের আরেক রূপ। কিন্তু আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ঊনশিয়ার মাকে কলকাতার ভিড়ে আর খুঁজে পাইনি কোনদিন। তুমি যেখানেই থাকো ভালো থেকো মা।

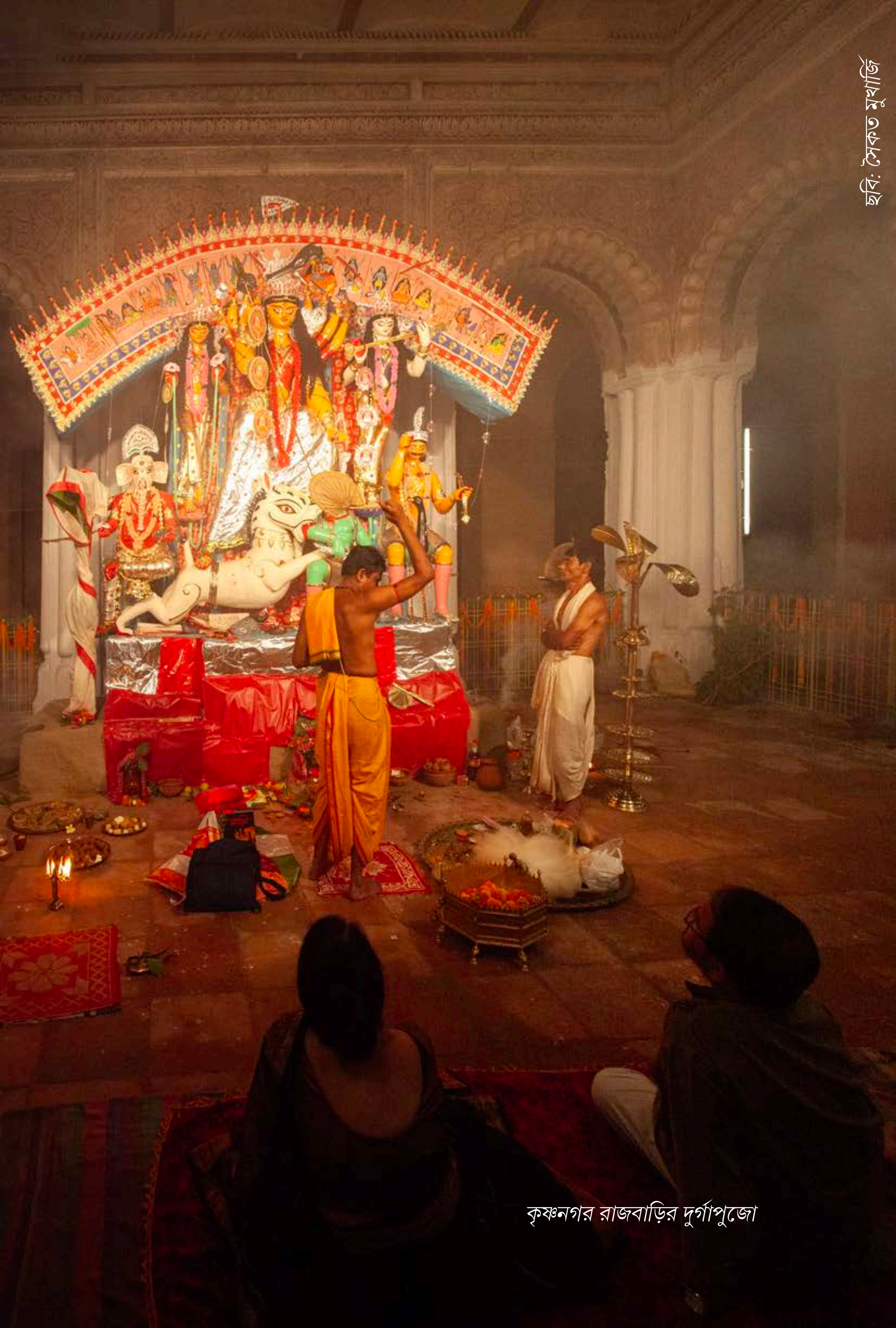

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির দুর্গাপুজো

ছবি: সৈকত মুখার্জি

ইরা দত্ত

শারদোৎসবের সেকাল-একাল

ইরা দত্তর জন্ম ১৯৩৫-এ হুগলি জেলার সুখড়িয়া গ্রামে মামার বাড়িতে, শৈশব কেটেছিল দর্জিপাড়ায়, ঠাকুরদার ভিটেতে। পরে বাবা সপরিবারে সরে আসেন টালিগঞ্জ রেলসেতুর অদূরে। বিবাহ সূত্রে ঠাঁইনাড়া হয়ে যান শ্যামবাজারের কাছে নন্দনবাগানে, ফ্ল্যাট কিনে শেষবেশ থিতু হওয়া বিধাননগরের বি-সি ব্লকে। রাসবিহারী মোড়ে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষারম্ভ। পরবর্তীতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের এই সাম্মানিক স্নাতক কর্মজীবন অতিবাহিত করেন নারকেলডাঙা গার্লস স্কুলে শিক্ষকতায়।

মা

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ হলেও, সবার সেরা বোধ করি দুর্গোৎসব। তার প্রাণের আনন্দ শারদীয় উৎসবে। সারা বছর ধরে নানান পুজো-অর্চনার মাঝে বাঙালি দুর্গোৎসবের দিন গোনে। কেন না, স্বল্প ক'টি দিনের জন্য হলেও, বিবাহিতা মেয়ে যখন বাপের বাড়ি আসে, তখন মা-বাবা-ভাই-বোন নিয়ে যেন বিবাহ-পূর্ব জীবনে ফিরে যায়। তেমনি আমাদের কন্যাসমা আনন্দময়ী মা দুর্গাকে আমরা আগমনী গান দিয়ে বন্দনা করে ঘরে আনি, চারটি দিন ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবাই আনন্দে মেতে উঠি; আবার পাঁচদিনের দিন বিজয়াদশমীতে চোখের জলে বিদায় জানিয়ে ৺শিবালয়ে তাঁর নিজের সংসারে পাঠিয়ে দিই—কানে-কানে বলি 'এমনি করেই আবার এসো মা'।

প্রথমেই বলি শারদোৎসবের প্রস্তুতিপর্বের কথা। পুজোয় চাই নতুন জামা, পোষাক-পরিচ্ছদ। আমাদের সময়ে অনেক মায়েরাই সন্তানের পোষাক নিজেদের হাতেই তৈরি করতেন। তাছাড়া দর্জির কাছে অর্ডার দেওয়ার রীতি তো ছিলই। তখন দর্জির দোকানে, ঘরে-ঘরে প্রায় দিন-রাতই সেলাই মেশিন চলত ঘর্ঘর শব্দে। এছাড়াও হাটে-বাজারে জামা-কাপড়ের রকমারি পসরা—তাতে যেন পুজো-পুজো পরিবেশটা আরো ঘনিয়ে উঠতো। এই সব পশসরা বিক্রির বেশ কয়েকটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান ছিল। যেমন আমার দিদিভাইয়ের (দিদিমা) মুখে হোয়াইটাওয়ে-লেইডল (Whiteaway Laidlaw)-র নাম শুনেছি, আমরা যেতাম বাঙালির আপন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ধর্মতলা স্ট্রিটের ‘কমলালয় স্টোর্স’-এ। সেই সঙ্গে ছিল আমাদের অতি প্রিয় ‘নিউ মার্কেট’, যেখানে কিনা ছুঁচসুতো থেকে আরম্ভ করে পোষাক-পরিচ্ছদ, শাড়ি-গয়না, শৌখিন বস্তু-সামগ্রীর বিপুল সম্ভার থরে-থরে সাজানো। আমাদের অঞ্চলে রাসবিহারী মোড়ের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের অধুনালুপ্ত ‘চন্দ্রকুমার স্টোর্স’ বা দেশপ্রিয় পার্কের পি. মজুমদার পুজোর কেনাকাটার ভিড়ে উপচে পড়তো।

পুজোর আগের এই সময়টাতে আমার মায়ের বলা একটা কবিতা এখনও যেন কানে বাজে—‘আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি, পূজার সময় এল কাছে। মধু বিধু দুই ভাই ছুটাছুটি করে তাই, আনন্দে দু-হাত তুলি নাচে।’ এইভাবে সব মধু-বিধুরাই, এমনকি অপেক্ষাকৃত বড়োরাও নতুন পরিচ্ছদের আশায় পুজো আসার দিন গোনেন। কিন্তু বিধি বাম: সবার

আশাই কি আর সেভাবে পূর্ণ হয়? মধু-বিধুর কথাই ধরুন— ওদের দীন-দরিদ্র বাবা এনে দিলেন খুবই সাধারণ ছিটের জামা। রাগে-দুঃখে-অভিমানে মধু তার ছিটের জামা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, ‘রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি, ফুলকাটা সাটিনের জামা’ ; আর আমাদের কিনা এই ছিটের কাপড়! তার এই পরশ্রীকাতরতা, দুরন্ত লোভ আর বাপের প্রতি অসম্মান দেখে মা তো হতবাক। সজল নয়নে তিনি বললেন, ‘এবার হয়নি ধান, কত গেছে লোকসান, ... তবু দেখো বহু ক্লেশে তোমাদের ভালোবেসে সাধ্য মত এনেছেন কিনে।’ বিধু কিন্তু সানন্দে গ্রহণ করেছিল তার সামান্য উপহার, মুছিয়ে দিয়েছিল মায়ের চোখের জল।

আমার জন্ম অবশ্য অবস্থাপন্ন ঘরে,মামারবাড়িও জমিদারবংশীয়। তাই ভালো-মন্দ মিশিয়ে জামাকাপড়ের ঘাটতি কোনো দিনই ছিল না। তবে আমাদের ছেলেবেলায় এখনকার তুলনায় বাহুল্য কম ছিল। বর্তমানে ঘরে-ঘরে এক-আধটি সন্তান, তাই আড়ম্বরও বেশি। আমরা পাঁচ-ছটি ভাইবোনে মহানন্দে ভাগযোগ করে যে যার মতো নতুন জামাকাপড় উপভোগ করতাম। তবে বাটা কোম্পানির শারদীয় বিজ্ঞাপন হত ‘পুজোয় চাই নতুন জুতো’। এটা একরকম আবশ্যকীয় (compulsory) পাওনা ছিল। এভাবেই এগিয়ে চলত পুজোর প্রস্তুতি।

ওদিকে শরতের মনোরম প্রকৃতি— বর্ষণসিক্ত আকাশে মেঘ-রোদের খেলা। স্কুল ছুটির দিন গোনা। ঘর-বাড়ি সাফসুতরো করা। আরো কত টুকিটাকি কাজ পুজোর আনন্দকে এগিয়ে আনতো।

গঙ্গার ঘাটে বাবার তর্পণ শেষ। এ কি! পুজো যে তাহলে একেবারে দোরগোড়ায়। আর কী, চল মামার বাড়ি। পুজো মানেই মামার বাড়ি যাওয়া— হুগলি জেলার সোমড়াবাজার স্টেশনের কাছে সুখড়িয়া (সুখ্ড়ে) গ্রামে। এক বিঘে জমির ওপর সে এক প্রাসাদোপম অট্টালিকা। প্রবেশপথের দুপাশে ফুলের বাগান, মোটা- মোটা থাম আর দেউড়ি পেরিয়ে চওড়া চকমেলানো দালান, মাঝে বিরাট উঠোন। উঠোনের মাঝখানের অংশ সুন্দর রেলিং আর থাম দিয়ে ঘেরা। তার ওপারে সিঁড়ির সারি পেরিয়ে বিশাল দুর্গাদালান। লম্বা-চওড়া বেদীর ওপরে ঋতুভেদে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতীর আরাধনার ব্যবস্থা।

কালনা থেকে এসে পালমশাইরা প্রতিমা গড়তেন। আমরা সাধারণত চতুর্থী-পঞ্চমীতে মামার বাড়ি যেতাম। তখন দালান আলো করে বিরাট দশপ্রহরণধারিণী দুর্গাপ্রতিমা বেদীর ওপরে অধিষ্ঠিতা; অপূর্ব ডাকের সাজে সজ্জিতা। তাঁর দশ হাতে রুপোর অস্ত্রশস্ত্র, সামনে ঘট ইত্যাদি কিছু রুপোর সরঞ্জাম সাজানো থাকতো। দালানে সারি-সারি ঢাক শুধু বাজানোর অপেক্ষায়।

পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠের নামে সঙ্কল্প করা হত। ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে পরম নিষ্ঠাভরে চলতো পুজো-অর্চনা। পুজোর যোগাড় অবশ্য বাড়ির মহিলারা করতেন না, তার জন্য আলাদা লোক নিযুক্ত করার প্রচলন ছিল। মস্ত-মস্ত পেতলের পরাতে আর সারি সারি মাটির খুরিতে সযত্নে নৈবেদ্য সাজানো হত।

মাতৃ-আরাধনার পনেরো দিন আগে থেকেই বোধনঘরে বোধন বসতো আর পুজোর ক’ টি দিন তার পাশে থাকতো

ভিয়েনের ব্যবস্থা— ভোগের জন্য লুচি-মিষ্টি তৈরি হত। এ তো গেল আনুষঙ্গিক আয়োজন। সর্বোপরি ছিল বলিদান পর্ব। আমার মাতৃকুল শাক্তমতে দীক্ষিত। তাই মহামায়ার সামনে পশুবলির ব্যবস্থা। বিরাট উঠোনের ছাদের স্তরের অংশটা তো খোলা, সেখানে বিশাল একটা পাল টাঙানো হত। বেশ কয়েকজন জনমজুর মিলে, বহু কসরত করে সেই পাল টাঙাতো। আবার পুজো শেষ হলে, সযত্নে খুলে রাখত ছাদের একটা ঘরে— যার নাম ছিল পালের ঘর। এই পাল খাটানো উঠোনে ছোটো-বড়ো হাড়িকাঠে হত বলির ব্যবস্থা। কয়েকজন সাহায্য করার লোক নিয়ে অমূল্য কামার নামে এক ব্যক্তি এই বলির কাজটি সমাধা করতো। নবমীর দিন দ্বিপ্রহরে সতেরোটি পাঁঠা, একটি ভেড়া ও একটি মোষ বলি হত।

মোষ বলিটা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল। হাড়িকাঠে মোষের মাথাটা ঢুকিয়ে, কাঠ দিয়ে বন্ধ করে, কয়েকজন সাঁওতাল জাতীয় মানুষ তার ওপরে চেপে বসতো। তা না হলে মোষটি নিজের প্রাণ বাঁচাতে উঠে বসবে আর বলির বিঘ্ন ঘটবে। খরচসাপেক্ষ বলে কিছুদিন পরে এ প্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

দশমীতে ঘট বিসর্জনের পর বাড়ির সকল সদস্য আয়নায় প্রতিফলিত দেবীর মুখ দর্শন করতেন। তারপরে বরণ; কনকাঞ্জলির ব্যবস্থাও ছিল। এখনও চোখের সামনে ভাসে— মায়ের মুষ্ঠি থেকে চাল ঢেলে দিচ্ছেন সেজদিভাই (দিদিমা), আর নীচে দণ্ডায়মান সেজদাদু কাপড় পেতে তা গ্রহণ করছেন।

এই সব ক্রিয়াকর্মের আগে চারদিনের অর্চনা আর সমাপ্তি-বন্দনা করতে দেখেছি মহেন্দ্র ভট্টাচার্য মশাইকে। চোখ দিয়ে

ঝরঝর করে জল পড়ছে আর জোড়হাতে কৃতাঞ্জলি পাঠ করছেন: "গচ্ছং গচ্ছং গচ্ছং দেবী পুনরাগমনায় চ"।

এর পরে বিসর্জনের পালা। বেশ একদল প্রজা আসতো, তাদের দ্বিপ্রাহরিক খাবার দেওয়া হত। ঘেরা উঠোনে সারি সারি বসে পরমানন্দে ভোজন শেষ করে, বিশাল প্রতিমাকে বেদীচ্যুত করে স্কন্ধোপরে উপবেশন করিয়ে, সিংহদরজা পেরিয়ে তারা গঙ্গার উদ্দেশে রওনা দিত। সঙ্গে চলতো ঢাকীদের বিসর্জনের বোল। দাদুরা, মামারা, বাড়ির অন্যান্য সদস্য, কাজের লোকজন সজল নয়নে সঙ্গী হত। মাকে একটি নৌকায় বসিয়ে, অন্য আর একটি নৌকায় করে ছোটো-বড়ো অনেকেই বাইচ খেলতে যেতেন।

ক'টি দিনের জাঁকজমক, হৈ-হট্টগোলের পর বাড়ি জুড়ে নেমে আসতো একটা বিরাট শূন্যতা, নিঃস্তব্ধতা। বিশ্বাস বাড়ির পুজোয় কলকাতার সব আত্মীয়-কুটুম্বজন ভিড় জমাতেন,সবার পাদস্পর্শে অত বড়ো বাড়িটা একেবারে গমগম করত।

গঙ্গাবক্ষে মাকে বিসর্জন দিয়ে, ঢাকীদের বিদায়ী সুরের সাথে সবাই বিষণ্ণ মনে ঘরে ফিরতেন। শূন্য বেদীর ওপরে একটি প্রদীপ জ্বালা থাকত। এবারে বিজয়ার প্রণাম-আশীর্বাদের পালা। দীনার (মায়ের ঠাকুমার) দালান-ঘরে ছোটো-বড়ো সব সদস্য সমবেত হতেন। চলতো প্রণাম-আশীর্বাদ-কোলাকুলি আর মিষ্টিমুখ। ওদিকে সাদা ধবধবে ফরাস-তাকিয়া শোভিত ঢালাঘরে (দাদুদের বৈঠকখানা) গ্রামের বিশিষ্ট মানুষজন আসতেন বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে। তাঁদের যথাযথ আপ্যায়ন করা হত। এই আমার ছেলেবেলার জমিদারবাড়ির সাবেকি পুজোর অভিজ্ঞতা।

ছেলেবেলার দিনগুলো এবারে শেষ হয়ে আসছে। পুজোর সময়ে মামার বাড়ি যাওয়া অনিয়মিত হয়ে গেল, পরিচয় ঘটল কলকাতার পুজোর সঙ্গে। পেলাম মনমাতানো নতুন একটা জিনিস, যা আজও পর্যন্ত সগৌরবে চলে আসছে। মহালয়ার ভোর চারটেয় রেডিও থেকে প্রচারিত চণ্ডীপাঠসহ গীতি-আলেখ্য “শ্রীশ্রী মহিষাসুরমর্দিনী”—বাণীকুমার, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজ কুমার মল্লিকের উপস্থাপনায় অপূর্ব এক অনুষ্ঠান, যা মায়ের আগমন-বার্তা জানায়।

দেখতে শুরু করলাম উত্তর কলকাতার বিশাল সব মণ্ডপ, বিরাট সব প্রতিমা। সেখানে নামকরা সব সর্বজনীন পুজো—বাগবাজার, সিমলা, আহিরীটোলা, হাতিবাগান, কাশী বোস লেন সর্বজনীন ইত্যাদি। এই সব পুজো একটু সাবেকি ধরণের। তুলনায় দক্ষিণ কলকাতার পুজো ও প্রতিমা হত কিছুটা ক্ষুদ্র আয়তনের। কিন্তু দক্ষিণে, বিশেষ করে বালিগঞ্জের প্রতিমা-প্যান্ডেলে থাকতো শৈল্পিক ছোঁয়া, বলা যেতে পারে artistic।

আমার বিবাহ-পূর্ব বসবাস ছিল টালিগঞ্জের চারু এভেনিউতে। পাড়ার নবপল্লী আর সামনের লেকপল্লীর পুজোর মধ্যে ছিল ঘোরতর প্রতিযোগিতা— বিশেষত বিসর্জনের সময়ে। আমাদের বাড়ির অদূরে মুদিয়ালির পুজো— সব কিছু ছিল ভারী চোখ-জুড়োনো শৈল্পিক রীতিসম্মত। এছাড়া দক্ষিণ কলকাতার হাজরা রোড, বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, তেইশ পল্লী দর্শনার্থীদের মাতিয়ে রাখত। একটা সময়ে বেশ কিছু দিন উজ্জ্বলা সিনেমার কাছে সঙ্ঘশ্রী-র পুজো খুব আলোড়ন তুলেছিল। আমরা দল বেঁধে পাড়ার সব বন্ধুরা মিলে কোনও একজনের অভিভাবকত্বে

সঙ্ঘশ্রী-র পথে পা বাড়াতাম। বেশ খানিকটা দূর, এদিকে পায়ে নতুন জুতোর ফোস্কা,সব কিছুকে তুচ্ছ করে সঙ্ঘশ্রী-র অভিমুখে রওনা দিতাম। এর সাথে সাথেই আরও কিছু প্রতিমা দর্শন হয়ে যেত। প্রায়শ এর ফাঁকে বাড়ির পুজোও চোখে পড়তো। সঙ্গে সঙ্গে মামার বাড়ির পুজোর স্মৃতি মনকে আনমনা করে তুলতো। বাড়ির পুজোর আমেজই যে আলাদা।

পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকতো আরও কিছু আনন্দের উপকরণ, যেমন পুজোর পত্রিকা, পুজোর গান। বড়োদের শারদীয় দেশ, আনন্দবাজার, বসুমতীর পাশাপাশি ছোটোদের শিশুসাথী, সন্দেশ প্রভৃতি পুজোর বাড়তি আনন্দের খোরাক যোগাতো। আর পুজোর গানের তো কোনো তুলনাই নেই। হেমন্ত, ধনঞ্জয়, মানব, শ্যামল, উৎপলা, প্রতিমা, সুপ্রভা, সন্ধ্যার সব মন মাতানো গান প্যান্ডেলে-প্যান্ডেলে বেজে আর রেডিওতে সম্প্রচারিত হয়ে পুজোর আনন্দকে দ্বিগুণ করে তুলতো।

এর পরের অধ্যায় একটু নতুন রকমের, একটু যেন অভিনবও। কেননা, নতুন শহরাঞ্চল সল্টলেক বা বিধাননগর গড়ে উঠছে, সেখানে নতুন বসতি, নতুন জীবনযাত্রার পদ্ধতি (life style)। সেখানে আমার শ্বশুর বাড়ির সবাই ফ্ল্যাট কিনে যৌথ পরিবার থেকে একক জীবন শুরু করলেন। সময়টা ১৯৮২-৮৩। বিয়ের বেশ কিছুদিন পরে একক সংসারের জীবন পদ্ধতিতে নতুন অভিজ্ঞতা হল।

উত্তর-দক্ষিণ কলকাতায় পুজোর পরে পাড়ায়-পাড়ায় জলসার প্রচলন ছিল। এখন বিধাননগরের পাড়া-কালচারের কথা। ব্লকে-ব্লকে ভাগ করা সল্ট লেক—AA থেকে শুরু।

এখানে দেখলাম প্রতি ব্লকে আলাদা-আলাদা পুজোর ব্যবস্থা। প্রতিমা-প্যান্ডেল চিত্তাকর্ষক তো বটেই, সাথে সাথে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে পংক্তিভোজের আয়োজন সল্ট লেকের বিশেষত্ব। পাড়ার প্রায় সব অধিবাসী উপস্থিত থাকতেন এই পংক্তিভোজনে। এক-এক দিন এক-এক রকম খাবার। উপস্থিত হতে না পারলে খাবারের প্যাকেট বাড়িতে আনা যেত। সান্ধ্য আরতির পরে প্রায় প্রতি রাত্রে স্থানীয়দের নিয়ে গান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদির ব্যবস্থা। ৺কালীপুজোর শেষে এক-এক বার এক-এক জন সেলিব্রিটিকে নিয়ে অতি চিত্তাকর্ষক ফাংশন—সবই এখানকার বিশেষত্ব। এই সময় থেকেই থিম (theme) পূজোর প্রচলন আরম্ভ হল। সম্ভবত তখনই বালীগঞ্জের বোস পুকুরের পুজোয় অপূর্ব শিল্পকলার প্রতিমা-প্যান্ডেল সারা কলকাতায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল। কলকাতার পুজোয় আলোর রোশনাই এক অসাধারণ দ্রষ্টব্য বস্তু। এই বিচিত্র আলোকসজ্জা পুজোর রাতকে মোহময়ী করে তোলে; তাই দিনের তুলনায় রাতের দর্শনার্থীর সংখ্যা অনেক গুণ বেশি হয়। কলকাতার সারা বছরের সব অভাব দূর করে, সব অন্ধকার বিদূরিত করে অপূর্ব আলোময় হয়ে ওঠে পুজোর ক'টি দিন।

বিধাননগর ধনী-দরিদ্র মিশ্রিত অঞ্চল; তুলনায় ধনীর সংখ্যা অবশ্য অনেক বেশি। পুজোতেও এই পার্থক্য থাকলেও, সব মিলিয়ে-মিশিয়ে বেশ একটা ঘরোয়া পরিবেশ অনুভব করা যেত। বর্তমানে অবশ্য পুজোর চাকচিক্য, আড়ম্বর অনেক গুণ বেড়ে গেলেও সেই ঘরোয়া পরিবেশ বা আতিথেয়তার অভাব বেশ চোখে পড়ার মতো। ব্লকে-ব্লকে প্রতিযোগিতা

আর বিভেদ। তবু এরই মধ্যে সল্টলেক বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পায়; চারদিকে তার জয়ধ্বনিও শোনা যায়। এমনি করেই কলকাতার আর সব পুজোর মতো বিধাননগরের সর্বজনীন পুজোও এগিয়ে চলেছে। ত্রুটিবিচ্যুতি, পরিবর্তন তো থাকবেই, তাই দোষটা হয়তো আমাদের মতো বয়স্ক মানুষজনের, যা৺দের দৃষ্টিভঙ্গি এ যুগে অচল। যাই হোক,প্রতি বছরের মতো এবারেও মা আসছেন—২০২০-র করোনার যুগে। মায়ের কল্যাণে, মায়ের আশীর্বাদে সব অকল্যাণ, সব অভিশাপ দূর হয়ে যাক এই প্রার্থনা—জয় জয় মা মহিষাসুরমর্দিনী, দুর্গতিনাশিনী।

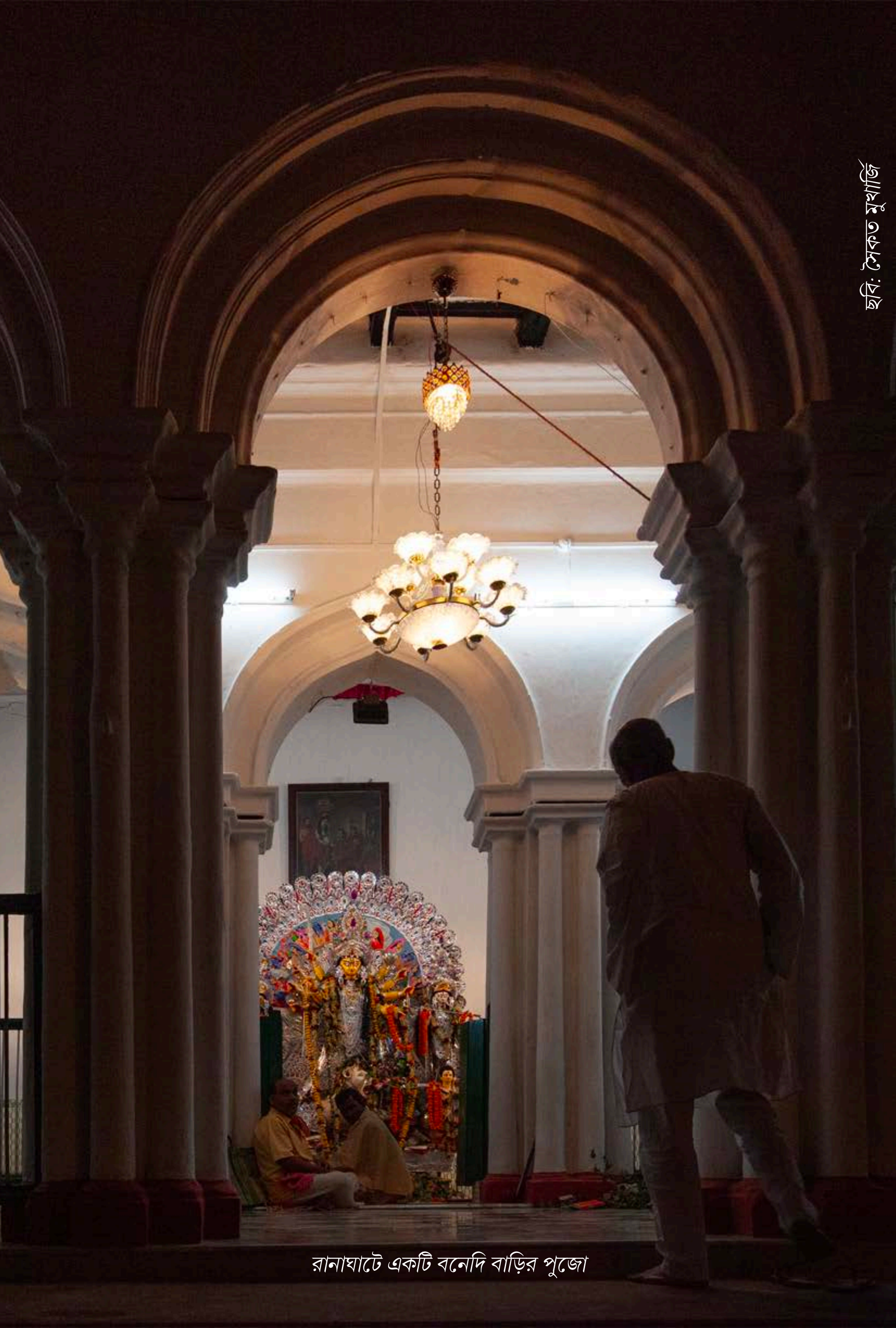

ছবি: সৈকত মুখার্জি

রানাঘাটে একটি বনেদি বাড়ির পুজো

প্রণতি মুখোপাধ্যায়

ফিরে দেখা দুর্গা পুজো

প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের জন্ম (১৯৩৭), বড়ো হওয়া ও শিক্ষালাভ কলকাতায়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা।

মা

কল্যাণীয়েষু সৈকত,

তোমার দুই তীরে শ্যামল তৃণের আচ্ছাদন, তোমার নদী তরতরিয়ে বইছে। আমার নদীতে সদাই ভাটার টান, দুই তীরের উষরতা পীড়াদায়ক। আর তুমি কিনা আমার কাছে এসে দাঁড়ালে, বললে, গল্প বলো। জিজ্ঞাসা করলে অল্প বয়সে পুজোর দিনগুলো কেমন করে কাটত। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি ওমা, আমার অল্প বয়সটাকেই যে আর দেখতেই পাইনে। আচ্ছা বেশ তবে শোনো, খুদকুঁড়ো যেটুকু যা মনে পড়ে। পুজোর মধ্যে সাধারণত অষ্টমীর দিন দিদির সঙ্গে রহড়া-র রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রমের পুজো দেখতে যেতাম। সেই চিরকালের চেনা এক চালচিত্রে সপরিবারে মা দুর্গার অবস্থান। গণেশের পাশে ছোটোখাটো একটা কলাগাছ লালপেড়ে কোরা শাড়িটি পরে দাঁড়িয়ে। হরিচরণ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান মতে, ‘গুচ্ছবন্ধা ও বধূবৎ অবগুণ্ঠনবতী কদলী-প্রভৃতি নব উদ্ভিজ্জের পত্রিকা; নবপত্রিকা, নবদুর্গা। … [সাধারণের বিশ্বাস নবপত্রিকা গণেশের বধূ]…।’ মনে পড়ে যাচ্ছে, ‘ও গণেশের মা কলাবৌকে জ্বালা দিয়ো না …।’ আচ্ছা, যা ছিল ললিত কলাবিধৌ সেই চৌষট্টি কলার অপভ্রংশ কি ঘোমটা টেনে অমন কলাবউটি সেজেছে! সে যাক, পুরোহিত কেষ্টদা পরবর্তীকালের স্বামী নিত্যানন্দ কি তদ্‌গত আত্মমগ্ন মূর্তি তখন তাঁর, সব মন্ত্র যেন কণ্ঠস্থ এমন মনে হত। ওই তো সামান্য তফাতে বসে তন্ত্রধারক বিধু মাষ্টারমশাই। দুজনে যেন একই সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। আগে তো পুরানো সেই লম্বা বাড়িটার দোতলায় ছিল ঠাকুরঘর, পরে মন্দির হলে সেখানেই বাঁদিকের মাঝামাঝি প্রতিমার অর্চনা। ওই অত বড়ো পূজা মণ্ডপ পুণ্যার্থী সমাগম, কাছের দূরের কত মানুষ, একপাশে ভক্তিমূলক গানের আয়োজন, যেসব ছেলেদের উপর পূজা ভাণ্ডারের দায়িত্ব, শান্ত পদক্ষেপে তারা যথাযথ পূজা উপচার নিয়ে আসা যাওয়া করছে। অন্যদিকের কোণে যে কটি বালকের উপর ধুনো জ্বালাবার ভার, তাদের সোৎসাহ সাফল্যে মণ্ডপ ধোঁয়ায় আছন্ন। যথাসময়ে ভোগ নিবেদনের আয়োজন, পর্দা টেনে দেওয়া হল। ভোগ নিবেদনান্তে অঞ্জলি দান, এরই প্রতীক্ষায় আপনাপন স্থান গ্রহণে সমবেত পূজার্থীরা ঈষৎ চঞ্চল। স্বামীজি—স্বামী পুণ্যানন্দ যেমন যেমন অঞ্জলি মন্ত্র উচ্চারণ করবেন, পুজার্থীদের সমবেত পুনরুচ্চারণে তা সম্পূর্ণ হবে। এ দৃশ্য অনেকবার দেখেছি, অঞ্জলি দিয়েছি, স্বামীজির পরলোকগমনের পরে যথারীতি অন্যে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন, তবু যেন আমাদের মনে স্বামীজির উপস্থিতির

অভাবটুকু পূরণ হয়নি। ১৯৪৪-এ স্বামী পুণ্যানন্দ মহারাজের দায়িত্বাধীনে এই বালকশ্রমের জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। তাঁর বিশ বছরের কর্মসাধনার ফলশ্রুতি, অবশ্যই সহযোগীরা ছিলেন ক্রমে তরুণ ছাত্ররাও নানান দায়িত্বভার নিয়েছেন। কতশত ছেলের মনে যে আজও তিনি অমর হয়ে আছেন।

যেদিন যেতাম সাধারণত সন্ধ্যারতি দেখেই ফিরতাম, তিন পুরোহিতের সমবেত আরতি, তাও দেখেছি। প্রধান পুরোহিত তো কেষ্টদা, একপাশে স্বামীজি আর অন্যপাশে কে থাকতেন, এখন মনে করতে পারছিনা। তিন পঞ্চপ্রদীপের আলো ধীর লয়ে একই ছন্দে আবর্তিত হচ্ছে, এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। একবারই বোধহয় সন্ধিপূজার সময় উপস্থিত ছিলাম। দুর্গাপূজার সে এক মহা সন্ধিক্ষণ। ঘর ভরা দর্শনার্থী নিস্তব্ধ নীরব, যেন নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও শোনা যায় না। ঘরের সব আলো নেভানো, অর্ধবৃত্তাকারে সাজানো একশো আটটি প্রদীপ একে একে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে, সেই আলোয় কি এক অপার্থিব সৌন্দর্য যেন ফুটে উঠল মাটির প্রতিমাকে ঘিরে।

ভাবছি মনে, আমার কাছে পুজোর অন্য দিনগুলোর তেমন কোনও বিশেষত্ব তো কিছুই নেই। অনেক দূর থেকে মাইকে বাজা গানের সুর অল্প স্বল্প ভেসে আসত। যেসব শারদীয়া পত্রিকার দর্শন মিলত সেগুলো একাকিত্বের অবকাশ ভরিয়ে দিত। আমার বিশ-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত জীবন কেটেছিল বউবাজার স্ট্রীটের বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের তেতলায়। পুজোর দিনে ঢাক ঢোলের আওয়াজের থেকেও বেশি শোনা যেত নিচের তলার প্রেসের কাজের সঙ্গে মিশে থাকা বিচিত্র আওয়াজ। সারাদিন মানুষজন

আসছে যাচ্ছে, সচল ট্রেডেল মেশিনের শব্দ, টেলিপ্রিন্টারের বিচিত্র ধ্বনি, শেষ রাতে রোটারি মেশিন চলতে শুরু করল, দৈনিক বসুমতী ছাপার কাজ চলছে। ভোর হতে না হতেই কর্ম ব্যস্ততা আরও বাড়ল দ্বারোয়ান পিওনদের হাঁকাহাঁকি, গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার আওয়াজ, বিভিন্ন স্থানে সংবাদপত্র বিতরণের জন্যে। পিওনরাও যার যার সাইকেলে পত্রিকার গোছা চাপিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে আপন আপন গন্তব্যে। খেয়াল করলে দেখা যাবে এখন বরং নিউজ বিভাগ অনেকটা শান্ত, রোটারি মেশিন চলার আগে পর্যন্ত যাঁদের দায়িত্ব ও কর্ম নিমগ্নতা অত্যন্ত বেশি ছিল। কয়েকজন লম্বা লম্বা টেবিলে শুয়ে দু-এক ঘণ্টার বিশ্রাম সেরে নিচ্ছেন। তবে ভোর রাত্র থেকেই চারপাশের কোলাহল কতটা যে তার উপযুক্ত ছিল, তা জানি না। এটা জানি আমাদের বাড়িতে বাইরে থেকে কেউ এলে তাঁদের রাতের ঘুমের ব্যাঘাত হত। আমাদের ঘুম ওই মেশিনের আওয়াজ মানুষজনের কলরবের মধ্যেই অনায়াসেই মিশে যেত। বরং কাশীতে গিয়ে রাতের নিস্তব্ধতা আর নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে খুব যে স্বস্তি বোধ করতাম তা নয়। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকও একটু যেন ব্যাঘাত ঘটাত।

পুজোর দিনেই হোক বা অন্য ছুটির দিনে হোক যত দিন না বড়ো হয়েছি হাতে অনেক অবকাশ। বাড়ির পশ্চিম দিকে মায়ের ঘর, তার উঁচু জানালায় বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে কত যে সময় কাটাতাম তার কোনও হিসেব নেই। আমার ডান দিকে লাটু পাড়ার বস্তি, মস্ত তার আয়তন। সামনে বউবাজার স্ট্রীটের ট্রাম লাইন আর আমহার্স্ট স্ট্রিট যেখানে এসে তার সঙ্গে মিলছে সে পর্যন্ত তার একদিকের সীমানা, অবশ্য এম বি সরকারের

অসমাপ্ত বাড়ি তার খানিক অংশ দখল করে ছিল। আর বস্তির পেছনেই লেডি ডাফরিন হাসপাতাল। জানালায় বসে বসে ওই বস্তির চলমান জীবনের অনেকটাই আমার চোখে ধরা দিত। ছেলেপুলেরা খেলাধুলো করছে—এই ভাব তো এই তুমুল ঝগড়া ঝাঁটি, মায়েরা কেউ কেউ এসে দু-এক ঘা পিটিয়ে যেত। কিন্তু ওদের তো অনেক কাজ হাতে সময় কই অন্য দিকে তাকানোর। এই দেখছি মাঠকোঠার খাড়া সিঁড়ি বেয়ে বাঁ কোলে ছেলে ডান হাতে জল ভরা বালতি। ওপরে উঠলে পরক্ষণেই এক রাশ জামা কাপড় নিয়ে নেমে এসে কাচা ধোওয়া করতে কলের দিকে চলেছে। সে আর আমার দৃষ্টিসীমানার মধ্যে নয়। আরও কত ঘর বাড়ি, একটু আধটু কত মানুষ দেখা, কত তাঁদের কাজ। একতলা বাড়িগুলোয় রোদের দেখা নেই, অনেকটাই অন্ধকার। আমাদের বাড়িটাই তো ওদের পুব দিকের রোদ বেশ একটু আড়াল করে দাঁড়িয়ে। আমার খুব ভালো লাগত ওই যারা টিনের বাক্স তৈরি করত তাদের কাজ দেখতে। সেটা অবশ্য মায়ের ঘর থেকে দেখা যেত না। বসুমতীর সরস্বতী মূর্তি দেওয়া বাড়িটার পিছনে আর একটা মস্ত বাড়ি তারও অনেকটাই প্রেসের অন্তর্গত। ওপর তলায় ঠাকুর ঘরের পাশ দিয়ে যে লম্বা সরু বারান্দা তার শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে বস্তির শেষ সীমানায় ওই টিনের বাক্স তৈরির কাজ দেখা যেত, সে চলছে তো চলছেই সারাদিন। বাক্স তৈরি হল, রঙ হল, সম্পূর্ণতা পেয়ে সে চলল খরিদ্দারের খোঁজে। সে সব কি আর আমার নজরে পড়ত। খানিক দেখছি আবার ডানদিকে ঘুরে লেডি ডাফরিনের সচল চেহারাটা আসছে নজরে আবার কখন বারান্দা পেরিয়ে একছুটে সামনের বাড়িতে ফিরে এসেছি। সেই

রঙ করা নীল বাক্সের ঢাকনা ওপর গোলাপ ফুল আঁকাটা শেষ হল কিনা সে আর দেখাই হল না।

বউবাজারে তখন রথের মেলা জমজমাট। রথের আগের দিন সন্ধেবেলা থেকে কত রাত পর্যন্ত তা কে জানে দু দিকের ফুটপাতে পশারিরা আপন আপন জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখত। কারও কারও চৌকি পড়ে যেত আগের দিনই, অনেকেই খড়ির দাগ টেনে নিজের নিজের পসরার অধিকার সাব্যস্ত করে রাখত। পরদিন যত ভোরেই ওঠো জানালা দিয়েও দেখবে আর সামনের ছাদে গেলে তো কথাই নেই রঙ বেরঙের জিনিষপত্র সাজিয়ে সারি সারি সব দোকান বসে গেছে। বেলা যত বাড়বে মেলা দেখা মানুষের ঢল নামবে রাস্তা জুড়ে। গেরস্থালির জিনিস, খেলনাপাতি, মাটির পুতুল, নানান গাছের চারা, গামলায় সাঁতার দেওয়া রঙিন মাছ, পাখিও কত রকমের— বুলবুলি মুনিয়া টিয়া চন্দনা ময়না বদ্রিকা নানা রকমের পায়রা আরও সব কত। চুপি চুপি বলে রাখি ক্রেতার আগ্রহ যেমন ছিল ঠকানে বিক্রেতাও কম ছিল না। বিশেষ করে মনে পরে রঙ করা চড়ুই পাখি। অন্য রঙ করা সাধারণ দেশি পাখিও সেজেগুজে কুলীন মর্যাদায় চড়া দামে পার হয়ে যেত। খরগোশ গিনিপিগও বেশ বিকত। তালপাতার সেপাই বড়ো মজাদার, যেমন সহজলভ্য তেমনি সহজ তার চাল চলন। তালপাতার শিল্প সবই বেশ নিরীহ গোছের কেবল তার ভেঁপুর আওয়াজে কান পাতা দায় হত। কিন্তু বাঁশি যে পেয়েছে সে তো মহা খুশি—‘বাজে বাঁশি পাতার বাঁশি আনন্দ স্বরে’। এসব দিশি শিল্পবস্তুর পাশে পাশে গোলাপি সবুজ হলুদ লাল নীল বেলুনের চাহিদাও কিছু কম ছিল ন। তেলেভাজা পাঁপড়

ভাজার দোকানও চলত রমরমিয়ে। বিকেলের দিকে হয়ত কারও সঙ্গে একবার আমিও ঘুরে আসতাম। পরে রাঙাদি-ফুলদি যখন শ্বশুর বাড়ি থেকে আসত ওঁদের সঙ্গে মেলা ঘোরার খুশির মাত্রাটা অন্যরকম হত, সে ঠিক বোঝানো যায় না। এসবের মধ্যে বিকেলের দিক থেকে রথের দেখা মিলত, দড়ি টেনে চলল সব হৈ হৈ করে সঙ্গে বাজছে কাঁসর ঘণ্টা। একবার স্মরণ পথে দেখা দিয়ে কি যাবে না 'রথযাত্রা লোকারণ্য মহা ধুমধাম'। কত রাত পর্যন্ত যে মেলা চলত তা কে জানে। ওরই মধ্যে সেই কাতর চোখে দোকান পানে চেয়ে থাকা ছেলেটাকেও তো ভোলা যায় না, 'এক পয়সার লাঠি কিনবে একটি পয়সা নাহি'—বউবাজারের রাস্তা থেকে রথের মেলা তো বহু দিন উঠে গিয়েছে, কিন্তু ওই কাতর চোখে চেয়ে থাকা ছেলেগুলো এখনও তো তেমনি করেই চেয়ে আছে, ছোট হাত বাড়িয়ে আছে মিষ্টির দোকানে খালি হয়ে যাওয়া দই-এর হাঁড়িটা যদি পায়। চেটেপুটে একটু স্বাদ তো পাবে।

মহরমের বিশাল মিছিলও যেত বাড়ির সামনে দিয়ে। সেপ্টেম্বরের চড়া রোদে দাঁড়িয়ে সে মিছিল দেখার আনন্দ কম ছিল না। ওই ছাদেই তো বীণারঞ্জিত সরস্বতী মূর্তি রোদ বৃষ্টি মাথায় নিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন আজও, উনিও নিশ্চয় দেখতেন। কত সুখ দুঃখের সাক্ষী শুধু নন সাথীও বটে। সে মানুষগুলোকে মনে পড়ে, মনে পড়ে তাঁদের সমবেত হাহাকার ধ্বনি আর বুক চাপড়ানোর আওয়াজ। আর শরবত বিতরণের চলমান গাড়িটা, তাকে কি ভোলা যায়!

কিন্তু সৈকত, তুমি তো জানো স্মৃতি তো সতত সুখের নয়, ১৯৪৬ সালে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম ক্লাস হল আর ক-দিন। আমি

যখন ক্লাস ফাইভে ১৯৪৭ সালের পনেরোই অগস্ট স্বাধীনতা এল। তার পিছনে কত রক্ত ঝরা দিন, কত চোখের জল, কত অসহায় মানুষের হাহাকার। আমার প্রিয় লাটু পাড়ার বস্তিতে আগুন লাগানো হল। আমাদের ঠাকুর দালানের সামনের দিকে আশ্রয় নেওয়া কত ভীত সন্ত্রস্ত নারী পুরুষ শিশুদের অসহায় চেহারা দেখেছি। চোখের সামনে না দেখি বাড়ির অন্য পাশের জেলেপাড়ার নিরীহ পুরুষেরা যে আত্মরক্ষার তাগিদে বাধ্য হয়ে রণ মূর্তি ধরে পথে নেমেছিল তাদের কথাও অল্পবিস্তর শুনতে পেতাম। দেশ জুড়ে যে আগুন জ্বলছিল তার পাশে এ আর কতটুকু! তার চেয়ে স্মরণ করা ভাল স্কুলের মাঠে আমাদের প্রাক স্বাধীনতা পর্বে কুচকাওয়াজের মহড়া। বর্ষাকালের সবুজ ঘাসে ভরা মাঠে মহড়ার দাপটে কত যে কেঁচোর প্রাণহানি ঘটত সে হিসেব আর কে রাখে! দেশাত্মবোধক রবীন্দ্রসংগীত তো ছিলই, নতুন লেখা দু-চারটে গানও এককালে মনে পড়ত— সেসব ভুলে গেছি, যেটুকু মনে আছে শোনো,

পনেরই আগস্ট পুণ্য দিন
স্বাধীন ভারতে জাগে নবীন
গাও তিন রঙা পতাকার তলে
নব জীবনের ঐক্যতান
বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম। ।

শোনো সৈকত, সব ভুলতে পারি, বেথুন স্কুলে পড়তাম তো স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটা ছোটো ব্যাজ সবাই পেয়েছিলাম এক টাকার বিনিময়ে। মাঝখানে তিন রঙা জাতীয় পতাকা, তাকে ঘিরে ওপরে ‘১৫ই আগস্ট ১৯৪৭’ নিচে ‘২৯শে শ্রাবণ ১৩৫৪’।

তখন প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবসের ভোরে স্কুলে পতাকা উত্তোলন আর মার্চ, সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত। আর জামায় সেই ব্যাজ, বহুকাল আমার সংগ্রহের বাক্সে সেটি সযত্নে রক্ষিত ছিল।

এমনও হয়েছে পূজোর সময় দিদি আর আমি কাশীতে, সেখানে আমদের ঠাকুমা থাকতেন তো। ওখানে বাড়ির কাছেই রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রমের পুজো, সেখানেও কোনও কোনও দিন গেছি। অদ্বৈতাশ্রমে প্রবীণ সন্ন্যাসীদেরই সংখ্যাধিক্য শরীরও প্রায় সকলেরই অশক্ত। পুজোর সময়ে তো বটেই, অন্য সময়েও তাঁদের কর্ম তৎপরতা যে কতখানি সহনশীলতা দাবি করত, তখনকার চেয়েও এখন যেন বেশি অনুভব করি। হরিপ্রেম মহারাজ, বরদা মহারাজ, নেপাল মহারাজ এমনই কতজনকে দেখেছি। যখনকার কথা মনে পড়ছে তখন অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী অপূর্বানন্দ।

আমার ঠাকুমা কাশীতে ‘বসুমতী মা’ নামে পরিচিত ছিলেন। যে ঘরে তিনি থাকতেন সে ঘরে তিনি একা। খাওয়া দাওয়া তো নেই সারাদিনে, একাদশীর নির্জলা উপবাসের পরেও দ্বাদশীর দিন অনেক রাতে দুধ আর হয়তো কয়েকটা কলা, ইচ্ছা হল তো ওই একটু ভেলি গুড় চলতেও পারে। প্রতিদিনের জীবন যাত্রায় ওই নিজের দুধের ঘটিটি মাজা, ঘরটি মোছা কাপড়টি কাচা, অবশিষ্ট সময়টুকু ওই জপতপ। সারাদিনে যে কেউ আসুক, উপবাস বা তৃষ্ণাজনিত তাঁর কোনও সমস্যাই তাঁরা টের পাবেন না। জীবনের শেষ পনেরো-বিশ বছর অপরাহ্ন থেকে উত্তীর্ণ সন্ধ্যা পর্যন্ত পরিচিত কাশীবাসী ও অন্যান্য পরিচিত-অপরিচিত মানুষজন যে তাঁর কাছে কতই আসতেন! আগ্রহভরে তাঁর মুখে

শুনতেন পরমহংসদেব, শ্রীমা এবং স্বামীজির স্মৃতিচারণ। আরও কত সদ্‌প্রসঙ্গ, আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনায় তন্ময় হয়ে যেতেন ঠাকুমা। অবশেষে শেষ আগন্তুকটিও যখন বিদায় নিয়ে যেতেন, তখনও কোনও ক্লান্তি নেই তাঁর, একা বসে আপন মনে গান গাইতেন। দেখে দেখে আমাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, অবাক হতাম না।

ঠাকুমা বেড়াতে খুব ভালোবাসতেন, প্রস্তাব দিলেই হল। তাঁর সঙ্গে কাশীর অনেক জায়গায় গেছি, সে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণার মন্দির হোক, আদি কেশব হোক বা দুর্গাবাড়ি সংকটমোচন আবার ঝাঁকিদর্শনের গোপালমন্দির তাও। সারনাথে গিয়ে বুদ্ধদেবকেও দেখে আসা চাই। সারনাথ যাওয়ার পথের দু-পাশের সবুজ শস্য খেতের শোভা সেকালে যে কি অপূর্ব ছিল ! ওদিকে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, রামনগরের রাজবাড়ি সেও আমরা প্রতি বছরই যেতাম। বিন্ধ্যেশ্বরী মন্দির অনেকটাই দূর সেখানেও গেছি দু-একবার।

আমাদের বাড়ির পিছনের রাস্তায় মুসলমানদের ঘর। ঘরে ঘরে তাঁত চলছে সোনা রুপোর জরির নকশা করা বেনারসি শাড়ি বোনা হচ্ছে, তাঁদের দক্ষতা যে কোন উচ্চ পর্যায়ের সেকথা ভাবলে আজও সম্ভ্রমে মাথা নত হয়। ব্যবসায়িক দরবারে তাঁদের কাজের যাচাই হবে, চলবে দর কষাকষি। লাভের সিংহ ভাগই ঢুকবে ব্যবসায়ীর পকেটে শিল্পীদের পাড়ায় আধ ভাঙা ছাউনি আর টিমটিমে আলো। ঠাকুমার সঙ্গে সেসব ঘরেও কখনো কখনো গেছি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁদের আত্মমগ্ন শিল্প সৃষ্টি দেখেছি। ইসমাইলের মতন চেনাজানাদের সঙ্গে নানা কথাও ঠাকুমা বলতেন।

মা দুর্গা কি আর কৈলাস থেকে আসেন আর অতিরঞ্জিত জাঁকজমকের মধ্যে কি তাঁর বাস? আমাদের চারপাশের মানুষের ভিতর যদি তাঁর আভাস না মেলে তাহলে তাঁর ভুবনমোহিনী রূপ দেখব কেমন করে? শুধুই কি মাটির প্রতিমায়! কিবা হবে ওই জাঁক জমকের স্মৃতিচারণে?

অক্ষর পরিচয়ের হাওয়ার আগেই রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গে পরিচয়, সেকালে যেমন হত মুখে মুখে শুনে শেখা আর কি। ‘পূজার সাজ’—

আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি
পূজার সময় এল কাছে।

সেবার ধান ভাল হয়নি, পিতা অর্থাভাব সত্ত্বেও দুই পুত্র মধু ও বিধুর জন্য সাধারণ ধুতি চাদর ও ছিটের জামা এনেছেন। বিধুর বেশ পছন্দ, মধুর খুব দুঃখ, ‘রায়বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি ফুল কাটা সাটিনের জামা’। মধু ধনী রায়বাবুর বাড়ি দৌড়ে গেল,‘রায়বাবু ব্যস্ত বড় দালান সাজাতে গেছে রাত ‘তারই মধ্যে মুধুর দুঃখের কথা জেনে ছেলেকে আদেশ করলেন, ‘তোর জামা দে তুই মধুরে’। এবার সাটিনের জামা গায়ে হাসি মুখে মধু চলেতে চলতে সবাইকে ডেকে ডেকে দেখাচ্ছে তার সাজ—

‘দেখ কাকা! দেখ চেয়ে মামা!
ওই আমাদের বিধু ছিট পরিয়াছে শুধু,
মোর গায়ে সাটিনের জামা।’
মা শুনি কহেন আসি লাজে অশ্রু জলে ভাসি,
কপালে করিয়া করাঘাত,

‘হই দুঃখী হই দীন কাহারো রাখি না ঋণ,
কারো কাছে পাতি নাই হাত।
তুমি আমাদেরই ছেলে ভিক্ষা লয়ে অবহেলে
অহংকার কর ধেয়ে ধেয়ে!
ছেঁড়া ধুতি আপনার ঢের বেশি দাম তার
ভিক্ষা-করা সাটিনের চেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ থেকেই সেসময় আমরা নীতিশিক্ষা পেয়েছি, কেউ উপদেশ দিয়ে শেখায়নি। সেকথা থাক ‘কাঙালিনী’ কবিতাটা মনে পরে যাচ্ছে, ধনীগৃহে উৎসব মুখরিত অঙ্গনে নতুন জামাকাপড় পরে ছেলেমেয়ের দল খেলছে হাসছে আনন্দে মেতেছে। এক দুঃখিনী মেয়ে বাইরে থেকে দেখছে সে দৃশ্য—

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে॥

বিশ্বভারতীর বিদ্যালয় পাঠ্য *পাঠপ্রচয়*-এ কাঙালিনী মেয়ের যে ছবি আছে, মলিন বেশ এলোচুল ওর মুখ দেখা যায় না, দ্বারের বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরের আনন্দ উজ্জ্বল দৃশ্য দেখছে— হঠাৎ মনে হল ওই তো আমি। ও তো তবু বাইরে থেকে আনন্দোজ্জ্বল দৃশ্যের মুখোমুখি, আমিও দেখছি আমার ভিতর পানে চেয়ে যে অন্তর ঐশ্বর্যে তার পূর্ণ হয়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল, সে হল কই। ‘বেলা গেল তোমার পথ চেয়ে। /শূন্য ঘাটে একা আমি॥’ শারদলক্ষ্মীর আবির্ভাবের দিনে জল স্থল অন্তরীক্ষে এমন সৌন্দর্য ও প্রশান্তির বিস্তার যখন, একা কই

আমি! কবি তো আমার চেতনা ফিরিয়ে দেন, ‘আনন্দধারা বহিছে ভুবনে’।

চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে॥

শুভার্থিনী
প্রণতি মুখোপাধ্যায়

২৫/৪এ অনাথ নাথ দেব লেন।
কলকাতা ৭০০০৩৭

অনুলিখন: অভীককুমার দে

শান্তা ভট্টাচার্য

পুজোর পাঁচালী

শান্তা ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৩৭-এ কলকাতায়। সেন্ট মার্গারেটস্ স্কুল, লোরেটো হাউস কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি শিক্ষালাভ করে মুরলীধর গার্লস কলেজ (১৯৬০-৬৭) ও বিশ্বভারতী (১৯৬৭-২০০০) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

মা

১৯৪০-এর দশকের কলকাতা। আমার বড়ো হয়ে ওঠা সেই কলকাতায় যেখানে সন্ধ্যে হলেই সাইরেন বাজার ভয়, বোমা পড়ার আশঙ্কায় ঘরে-বাইরে ঠুলি পরানো আলো, জানলার কাঁচে কাগজ সাঁটা, গলির মোড়ে মোড়ে রক্ষণ-দেওয়ালের (baffle wall) আড়াল। আমার সুদূরতম স্মৃতির প্রান্তে দেখতে পাই ১৯৪১-এ রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণে বজ্রাহত আত্মীয়পরিজনের মুখচ্ছবি। ১৯৪২-এর অগাষ্টে ভারত ছাড়ো আন্দোলনে আমার পিসতুতো দিদির দীর্ঘ কারাবাসে উদ্বিগ্ন পরিবার, ৪৩-এর ভয়াবহ মন্বন্তরের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, ১৯৪৫-এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার স্বস্তির পাশাপাশি নেতাজীকে কেন্দ্র করে আবেগে উত্তাল কলকাতা, ’৪৬-এ হাড়হিম করা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ১৯৪৭-এ স্বাধীনতার উৎসব আর দেশভাগের হাহাকার, ’৪৮-এ গান্ধীজীর

হত্যা। কিছু বোঝা, আর অনেক কিছু না বোঝার অস্থির,উৎকণ্ঠিত শৈশবস্মৃতির মধ্যে দিয়ে ফিরে দেখার চেষ্টা করছি সেই সময়ের দুর্গা পুজোকে। এই ফিরে দেখায় ৪০ ও ৫০-এর দশক অনেক সময়েই একাকার হয়ে আছে।

দেখতে পাচ্ছি আমাদের ঠাকুমার নিত্যপুজোর দেবদেবীদের একান্নবর্তী পরিবারের সদস্যদের (রাধাকৃষ্ণ, শিব, কালী, নারায়ণ, গণেশ, গোপাল) জন্য মা নতুন সিল্কের কাপড়ের টুকরোয় লেস বসিয়ে পুজোর পোষাক তৈরি করছেন। আমরা বোনেরা অপটু হাতে যতটা পারছি মাকে সাহায্য করছি। আমাদের বড়ো শোবার ঘরের কোণে স্তূপ করে জমা হচ্ছে দিশি মিলের ধূতি, শাড়ি, থান। প্রতিটির ওপর একটি চকচকে রঙচঙে ঠাকুরদেবতার ছবি আঠা দিয়ে লাগানো। ঐ ছবিগুলির দখলদারি নিয়ে বোনেদের মধ্যে রেষারেষি। কোরা কাপড়ের গন্ধে পুজোর আগমনী। মহালয়ার পর থেকে অভাবী মানুষজনেরা আসবেন পুজোর জামাকাপড় নিতে। মা তাঁদের নাম লিখে রাখছেন হিসেবের খাতায়, রাত্রে সংসারের কাজ সারা হলে। আমাদের সম্পন্ন পরিবার তখন অনেকের ভরসাস্থল এবং সেটাই তখন স্বাভাবিক, সামাজিক নিয়ম ছিল।

কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের স্বদেশী তাঁত শিল্প আর কলকাতা ইউনিভার্সিটির আশুতোষ বিল্ডিঙ্-এর একতলায় ইষ্টবেঙ্গল সোসাইটির দোকান থেকে মা পুজোর বাজার করে এনেছেন। তাঁতের ধূতি শাড়ির গায়ে প্রাপকদের নাম লিখে লিখে আলমারিতে তোলা হবে, আমরা বসেছি কাগজের টুকরো আর পেন্সিল নিয়ে। বাড়ির লোক,নিকট-দূর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব,পরিচারক-পরিচারিকা। কেবলমাত্র নতুন কুটুমদের

বাদ দিলে অন্যদের জন্যে কেনা জিনিসের দামে ও মানে খুব একটা হেরফের হতো বলে আমার মনে হয়নি। তবে বড়োদের আলোচনায় সুতোর সূক্ষ্মতা আর বহরের মাপের উল্লেখ মনে পড়ে। নিশ্চয় উনিশ-বিশ ছিল। নতুন শাড়ির ওপর বারবার হাত বোলাতে ও নাক লাগিয়ে গন্ধ শুঁকতে গিয়ে মার কাছে বকুনি খাওয়া আমার অবধারিত ছিল। অবুঝ আত্মীয় মহিলাদের আবদার রাখতে সেই কাপড়ের পাঁজা মাঝে মাঝে আলমারি থেকে মাকে নামিয়ে দেখাতে হোত। সংসারে সদাব্যস্ত মা বিব্রত হতেন, আমার খুব আহ্লাদ হোত আবার একবার নতুন শাড়ির গন্ধে ও স্পর্শে।

আমাদের অর্থাৎ বাড়ির ছোটদের জামা তৈরি করতো মেটিয়াবুরুজের সুলেমান দর্জি। পুজোর অর্ডার নেবার সময় সে নানা ফ্যাসানের ছবিওয়ালা বই নিয়ে আসতো। বড়ো হয়ে শুনেছি আমি নাকি ছোটবেলায় একটু সৌখিন ছিলাম। তাই সে আমার জামা তৈরিতে বিশেষ যত্ন নিতো, জামা পছন্দ না হলে আমার হাতপা চালানোর সুনাম ছিল। রেডিমেড জামাকাপড় কেনার চল তখনও আমাদের বাড়িতে তেমন ছিল না। পোশাকের সংখ্যা বা দাম নিয়ে বাড়িতে কাউকে মাথা ঘামাতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পুজোর সময় ছোটদের মধ্যে কে কটা ঠাকুর দেখেছি সেটাই ছিল বড়াই করার বিষয়।

আমার আসল পুজো শুরু হোত যেদিন পূজোবার্ষিকী আসতো তাদের আশ্চর্য রূপ, রস, গন্ধ নিয়ে। দেব সাহিত্য কুটিরের পূজাবার্ষিকী, শিশুসাথীর পুজো সংখ্যা, পুজোয় প্রকাশিত আরও অন্য কত বই। এখন তাদের নাম মনে নেই। সারা বছর ধরেই আমাদের বই কেনা, বই পাওয়া চলতো,

নববর্ষে, জন্মদিনে,যে কোনো উপলক্ষে অথবা বিনা উপলক্ষে। কিন্তু পূজাবার্ষিকীর লেখার বিচিত্র সম্ভার একেবারে মাতাল করে দিতো। সবচেয়ে মনকাড়া যে বার্ষিকীটির কথা মনে আছে সেটি দেব সাহিত্য কুটিরের 'কলরব', এবং তার পরের বছরের 'আলপনা'। তখনকার প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরা এই সব বইয়ে লিখতেন। তাঁরা যে নামকরা লেখক সে তো জেনেছি কত পরে। এইসব বইয়ের পাতাতেই পরিচয় বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী,কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও আরও কতজনের সঙ্গে।

দেখতে দেখতে ষষ্ঠী এসে যেতো। আগেই বাড়িঘর মেজেঘষে সেজে তৈরি। 'মা আসছেন।' সবসময়ই লোকের মুখে তখন একটি বাক্য,'মা আসছেন।' অতএব ভাইবোনে ঝগড়া মারামারি করা যাবে না, খোলা চুলে সন্ধে অবধি বই মুখে বিছানায় গড়ানো চলবে না। ষষ্ঠীর বিকেলে আমাদের আলতা পরার পালা। পায়ে সুড়সুড়ি লাগছে বলে মার কাছে নিস্তার মিলতো না। তারপর নতুন জামা-কাপড় পরে পাড়ার ঠাকুর দেখতে বেরোনো।

আমাদের বাড়ি সিমলা পাড়ায়। সেখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে স্বামীজির বাড়ি। সিমলা ষ্ট্রীটে সেই বাড়ির পিছনের প্রান্ত ঘেঁষে পুজো মণ্ডপ হতো বিবেকানন্দ স্পোর্টিঙ্ ক্লাবের। স্বামীজির নামাঙ্কিত ক্লাব। ক্লাবের প্রতিমা গড়তেন মণি পাল, রমেশ পালের মতো নামী ভাস্কররা। শুনতাম অতীতে নাকি কিংবদন্তি ভাস্কর জি. পালও আমাদের ঠাকুর গড়েছিলেন। বারোয়ারী পুজো, কিন্তু আমরা ভাবতাম আমাদের পুজো। গর্বের সীমা ছিল না। পুজোর ক'দিন ঘুরে ফিরে কেবলই ঐ মণ্ডপের সামনে দাঁড়ানো আর

আত্মতৃপ্তিতে ভাবা 'এমনটি কোথাও হয়নি। 'পাড়ার উৎসাহী যুবকরা বই-এর স্টল খুলতেন। একবার স্টলে সদ্যপ্রয়াত কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বই বিক্রি হচ্ছিল। আমরা তখনও তাঁর নাম শুনিনি। উদ্যোক্তা এক পরিচিত দাদার পরামর্শে বইও কিনলাম। তবে কবিকে চিনতে আরও কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

আমাদের পাড়াতেই একটু দূরে সিমলা ব্যায়াম সমিতির পুজোর ছিল অন্য মহিমা। আমাদের আদ্যন্ত জাতীয়তাবাদী পরিবারে শৈশব থেকে শুনতাম বিপ্লবী আন্দোলনের কথা, বাড়িতে আসতেন বিভিন্ন প্রাক্তন বিপ্লবীরা। সিমলা ব্যায়াম সমিতির ইতিহাস শোনা ছিল। তার ওপর আমাদের পাড়াতেই থাকতেন ঐ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা, বিপ্লবী অতীন বসু ও তাঁর বিপ্লবী পুত্র অমর বসু ও তাঁর ভাইরা। আমাদের পারিবারিক যোগাযোগও ছিল তাঁদের সঙ্গে। ঐ সমিতিতে শরীরচর্চা ছিল তরুণদের দেশ সেবার প্রস্তুতিপর্ব। খুব শৈশবেই মনের মধ্যে দুর্গাপুজোর সঙ্গে মাতৃভূমির আরাধনার অনুষঙ্গ জড়িয়ে গিয়েছিল। ওখানে প্রতিবছর প্রর্দশনী হোত। দেশভক্ত মনীষীদের উদ্ধৃতি দেওয়া পোস্টার ও ব্যানার টাঙানো হোত। শুনেছি যুদ্ধের সময় কয়েক বছর এই পুজো বন্ধ ছিল। তারও আগে কোনো সময়ে সরকারি রোষে পুজো বন্ধ রাখতে হয়েছিল। শুনতাম সর্বজনীন পুজোর প্রচলনও আরম্ভ হয় অতীন বসুর হাতে সিমলা ব্যায়াম সমিতির মাঠে। ওখানে ঠাকুর দেখতে যাওয়ার সময় কেমন যেন বুকের মধ্যে টানটান লাগতো।

সপ্তমীর সকালে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম আমাদের পাড়ার কর্পোরেশনের কাউন্সিলর গোবিন্দ দে-র

বাড়ির পুজোর কলাবউ স্নান করিয়ে বাজনা বাজিয়ে সকলে ফিরছেন। ঐ বাজনাটি শুনতে না পেলে যেন পুজো শুরু হোত না। কাছাকাছির মধ্যে ঐ একটিই বাড়ির পুজো। ওঁদের বাড়ির জনবিরল বিশাল নাটমন্দিরটি আমার ভারি ভালো লাগতো। পুজোর কদিন সেখানে সকলের প্রবেশ অবাধ ছিল। তবে গেটে ছোটদের মনে সম্ভ্রম জাগানো একজন দরোয়ান মোতায়েন থাকতেন।

অষ্টমীর দিন সকাল থেকে উপোস করে, শাড়ি পরে বড়দের সঙ্গে অঞ্জলি দিতে যাওয়া পুজোর অনুষ্ঠানে সরাসরি যোগ দেওয়ার একমাত্র অবকাশ ছিল। ধূপধুনোর গন্ধ আর পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ আমার প্রাপ্তবয়সের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গণ্ডি পেরিয়ে অস্তিত্বের অপ্রতিরোধ্য অংশ হয়ে গেছে তা এখনো প্রতি পুজোয় উপলব্ধি করি।

অষ্টমীর সন্ধ্যা ছিল দক্ষিণ কলকাতার জন্য নির্ধারিত। সেদিন আমরা একটু সচেতন ভাবে সাজগোজ করতাম। সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরতাম। বালিগঞ্জের সঙ্গে ফ্যাসান ও সৌখিনতার সম্পর্ক এমন একটা ধারণা উত্তর কলকাতায় প্রচলিত ছিল। দক্ষিণের তখনকার বিখ্যাত পুজোগুলির মধ্যে ছিল ২২ ও ২৩ এর পল্লী, সঙ্ঘশ্রী। উত্তর কলকাতায় বাগবাজার, কুমারটুলি, আহিরিটোলা। দমকলের ঠাকুরও খুব বিখ্যাত ছিল, তবে সেটা বোধহয় আরও পরের দিকে শুরু হয়। ইষ্ট গভর্ণমেন্ট প্লেসে,স্পেনসেস হোটেলের উল্টো দিকে গভর্ণর হাউসের কর্মীরা পুজোর ব্যবস্থা করতেন। অতি সুন্দর প্রতিমা এবং প্রায় জনহীন মণ্ডপ। ওখানে না গেলে চলতো না আমাদের।

বছরের শ্রেষ্ঠ পুজো নিয়ে প্রতিযোগিতার আবহাওয়া তখনও ছিল। জানিনা কারা সেটা নির্ধারণ করতেন এবং কিভাবেই বা সেটা প্রচারিত হতো। তবে শ্রেষ্ঠতার মাপকাঠি ছিল প্রতিমার সৌন্দর্য। আর সকলই বাহ্য।

নবমীর দিন সন্ধ্যে থেকে শুরু হোত বিজয়া দশমীর প্রস্তুতি। তখন সব বাড়িতেই নিমকি,গজা, নাড়ু তৈরি করা হোত। আমার মার অসামান্য রন্ধনদক্ষতা ছিল। অতিথিরা জানতেন পুজোর পর দেখা করতে গেলে মালপোয়া আর ক্ষীরের পাটিসাপটা অপেক্ষা করছে। দেখা করতে আসতেন আত্মীয়-স্বজন, আমাদের বাবার বন্ধুরা এবং ব্যবসাসূত্রে বিরাট পরিচিতমণ্ডলী, আমাদের ভাইবোনদের বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশীরা। কালীপুজো পর্যন্ত চলতো সেই জনস্রোত। ভাইফোঁটার উৎসব শেষ হয়ে যাবার পর অভ্যস্ত দৈনন্দিন জীবনে ফিরে বড়ো ফাঁকা লাগতো কদিন।

পুজোর ক'দিন মা একটু স্মৃতিকাতর হয়ে থাকতেন। আমার মামার বাড়ি বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামে। সেখানে বাড়ির পুজো। কলকাতার বিরাট সংসার ফেলে মাকে কখনো পুজোর সময়ে বাপের বাড়ি যেতে দেখিনি। বলতে গেলে কখনোই যেতে দেখেছি কিনা মনে পড়ে না। মা তাঁর বাল্যের, কৈশোরের পুজোর গল্প বলতেন। শুনতে শুনতে মনে হোত সব দেখতে পাচ্ছি। গ্রামের ছড়ানো বাড়ির উঠোনের নির্দিষ্ট ঘরে ভিয়েন বসেছে, তৈরি হচ্ছে বেলিয়াতোড়ের বিখ্যাত মিষ্টি ম্যাচা, খাজা, বুটের নাড়ু। বাড়ির কোনো ছেলে ভোর বেলা স্নান করে, তসরের জোড় পরে বাড়ির ঠাকুর ঘর থেকে নারায়ণ শিলাকে বুকের কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন ঠাকুর মণ্ডপে। ১৯৫৫তে বি.এ. পড়ার সময় আমি

একটা পুজোর ছুটি মামার বাড়ির দেশে কাটিয়েছিলাম। ততদিনে সেখানে অনেক বদল হয়েছে, ব্যবস্থার অনেক কাটছাঁট হয়েছে, তবু মার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে অসুবিধে হয়নি। সকাল থেকে সন্ধ্যে সারাদিন দুর্গামেলায় প্রতিমা গড়া দেখা, আশেপাশে আত্মীয়দের কাছে কেবল আমি আমার মার মেয়ে বলে বিশেষ যত্ন আদর পাওয়া, প্রথম নিজেদের বাড়ির পুজো দেখার অভিজ্ঞতা, সময় সেই আনন্দ স্মৃতির কিছুই চুরি করতে পারেনি। কলকাতায় ফিরে এসে আমিই মাকে তাঁর বাপের বাড়ির গল্প শোনালাম।

আরও শুনতাম আমাদের দেশ যশোর জেলার হরিশঙ্করপুর গ্রামের পুজোর গল্প। ঠাকুমার কাছে, পিসিমাদের কাছে। আমার বীজগণিত খ্যাত ঠাকুরদা কে.পি.বসু দেশের পুজোকে নাকি দানধ্যান, অতিথি আপ্যায়নে মহোৎসবে পরিণত করতেন। আমরা যখন সেই গল্প শুনছি তখনই সে সব ইতিহাস হয়ে গেছে। আমার দেশে যাবার অতি শৈশবের স্মৃতিরও কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। সুবিধে মতো দেশে যাবো এই ভালোবাসার ভাবনাটা দেশভাগের পর আর ভাবা যায়নি, ভাবতে ইচ্ছেও বোধহয় হয়নি। বাংলাদেশ আরকাইভসে রাখা ঠাকুরদার সেই বাড়ির ও ঠাকুরদালানের ছবি ইউটিউবে দেখেছি। দেখে মন হু হু করে ওঠে। স্মৃতির বাইরেও কি কোনো টান রক্তে প্রবাহিত হয়!

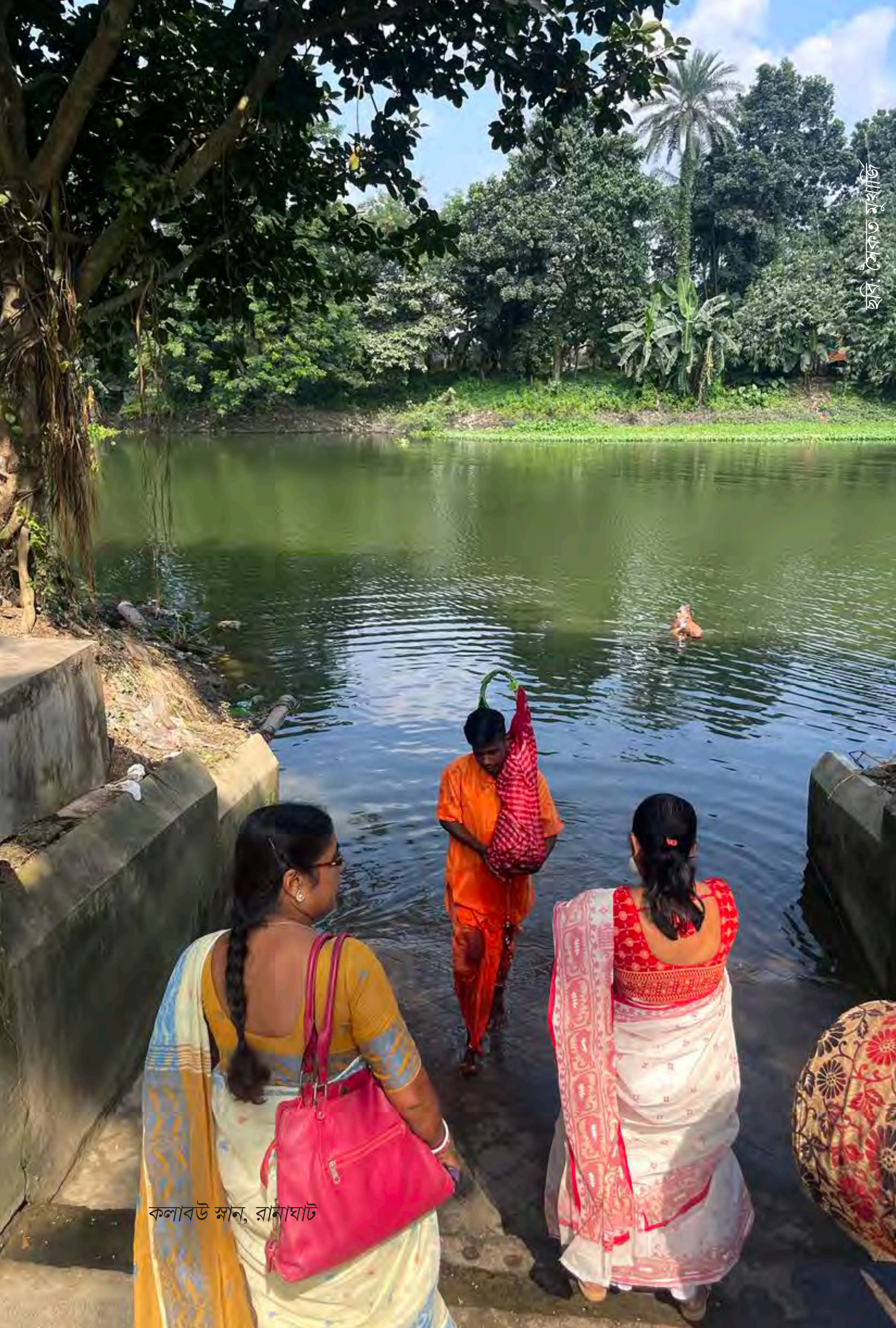

কলাবউ স্নান, রানাঘাট

ছবি: সৈকত মুখার্জি

সলিলা দাস

স্মৃতির দুর্গাপুজো

সলিলা দাসের জন্ম ১৯৩৭-এ নদিয়ার রানাঘাটে। ব্রজবালা উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ে তাঁর পাঠ শুরু। পরে লেডি ব্রেবোন কলেজ থেকে তিনি উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বিবাহসূত্রে চন্দননগরের বাসিন্দা তিনি। পড়াতেন সেখানকার একটি স্কুলে।

মা

চূর্ণী নদীর তীরে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম রাণাঘাট, নদীয়া জেলায় অবস্থিত। রাণাঘাটের একদিক দিয়ে বয়ে চলেছে চূর্ণী নদী, অন্যদিকে রাণাঘাট জংশন স্টেশন।

এই রাণাঘাটকে, যদিও এখন গ্রাম বলা যাবে না, কারণ দেশভাগের পর স্টেশনের অপর পারে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত লোকালয় এবং মূল গ্রামের ভেতরে অজস্র ফ্ল্যাটবাড়ির অবস্থানে একেবারে শহর হয়ে গেছে।

রাণাঘাটের তিনটি বাড়ী ছিল বিখ্যাত— পালচৌধুরী বাড়ী, কাঁসারী বাড়ী ও পালবাড়ী। এই তিনটি বাড়ীকেই ঘিরে হত বড় বড় পূজা-পার্বণ যাতে গ্রামের সকলেই প্রায় অংশ নিতেন।

এখানে প্রধান বক্তব্য কাঁসারী বাড়ী নিয়ে, গ্রামের একেবারে মধ্যস্থলে এই বাড়ী প্রধানত শ্যামাপ্রসাদ দাসের উদ্যোগেই তৈরী

হয়। পরবর্তীকালে সেটা পাঁচ শরিকের মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি বড় চৌকো উঠানকে ঘিরে সকলে পৃথক পৃথক বাড়ী প্রস্তুত করে নেন। এইরকম এক শরিকের বাড়ীর ছেলে বিহারের রাঁচিতে ব্যবসা উপলক্ষে গিয়ে সেখানেই বাড়ী, ঘর, ব্যবসা নিয়ে থেকে যান এবং যথেষ্ট পয়সা করেন। তাঁর নাম শ্রীতমালকৃষ্ণ দাস। মূল বাড়ীর অধিকার তিনি ছেড়ে দেন। সে উঠানকে কেন্দ্র করে সব শরিকানি বাড়ী গড়ে ওঠে সেই উঠানে সব বাড়ীরই বিবাহ অনুষ্ঠান হত। চারদিকের রোয়াকে বাড়ীর ছোটদের চলতো চোর পুলিশ খেলা।

যে বাড়ীটাকে ঘিরে নানা অনুষ্ঠান ইত্যাদি চলতো তার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ দাস। এককালে এরই ভাইপো বটকৃষ্ণ দাস আসামের রাজধানী শিলং-এ ভাগ্যান্বেষণে যান, পরে সরকারি চাকরি পেয়ে আবার বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ওঁরই সঙ্গে গিয়েছিলেন শ্রীনৃসিংহপ্রসাদ দাস। তিনি অত্যন্ত করিতকর্মা ব্যক্তি ছিলেন। শিলং-এ একটা দোকানে কাজ নেওয়ার পর ওখানকার P.W.D. Officer হিসাবে যথেষ্ট নাম করেন এবং শিলং-এই বাড়ী ও হার্ডওয়ারের দোকান করেন। পরবর্তীকালে রাণাঘাটের পৈতৃক বাড়ী খুড়তুতো ভাই বটকৃষ্ণ দাসকে সব অধিকার ছেড়ে দিয়ে নিজেই পৃথক বাড়ী তৈরী করেন। পৈতৃক বাড়ীর সংলগ্ন জমিতে বিরাট দোতলা বাড়ী এবং তার কিছুদিন পরেই বাড়ীর পূর্বদিকে বেশ বড় পূজামণ্ডপ তৈরী করিয়ে দুর্গাপূজা শুরু করেন। অত্যন্ত করিতকর্মা এই ভদ্রলোক খুবই স্বল্পায়ু ছিলেন। মাত্র ৪৯ বছর বয়সেই তাঁর মৃত্যু হয়। যেহেতু শরিকানি পূজা তাও আজও সেই পূজা বংশ পরম্পরায় চলে আসছে।

এই পূজামণ্ডপে জন্মাষ্টমীর দিন পাট পূজ করে মূর্তি নির্ম্মাণ শুরু হত। দু'জন কুমোর এই মণ্ডপেই সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত কাজ করে ষষ্ঠীর আগেই ঠাকুর গড়া শেষ করত। তখনও রাণাঘাটে ইলেকট্রিক আসেনি তাই একটা বড় পেট্রোম্যাক্স জ্বালিয়ে দেওয়া হত। পাঁচ বাড়ীর সব স্কুল পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা স্কুল থেকে ফিরেই জামাকাপড় ছেড়ে অল্প কিছু খেয়ে ঠাকুরদালানে উপস্থিত হত ঠাকুর তৈরী দেখতে। পঞ্চমী পর্যন্ত চলতো এই দেখা। কখন গহনা পড়ানো হবে, কখন অসুরের বুকে ত্রিশূলটা লাগানো হবে যা না পড়ে গিয়ে বুকের সঙ্গে আটকে থাকবে, কখন গণেশের শুঁড়টা তৈরী হবে—তবে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল মা দুর্গার চক্ষুদান পর্ব। প্রধান কারিগর সকলকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতেন যাতে তাঁর মনসংযোগের বিঘ্ন না ঘটে। বাইরে বাকী সকলে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর সেই শুভ মুহূর্ত, দরজা খুলল ঠাকুরের চোখের দিকে তাকিয়ে তাঁর অলৌকিক সৌন্দর্যে সবাই মুগ্ধ বিস্মিত হতাম।

এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু —জননী এই মূর্তিই কি আমাদের চোখের সামনে দেখেছি বিশ্বাস হচ্ছে না।

যাইহোক ষষ্ঠীর দিন মায়ের বোধন দিয়ে এই পূজার শুরু। বাড়ীর বাঁধা পুরুতমশাই তার এক সঙ্গীকে নিয়ে পূজা আরম্ভ করতেন। পাঁচ শরিকের বাড়ীর সব বয়স্ক মহিলারাই পূজার ফলকাটা, নৈবেদ্য করা, ফুল, তুলসী, বেলপাতা দিয়ে দেবীর আরাধনার আয়োজন সম্পূর্ণ করতেন। মালা গাঁথার একটা পর্ব ছিল। নারকেল নাড়ু দু-দিন আগে থেকে করতে আরম্ভ হত, না হলে প্রসাদের সঙ্গে নাড় কুলিয়ে উঠতে পারত না। আশপাশের

সব বাড়ীর থেকে দর্শনার্থী এসে অঞ্জলি দিয়ে প্রসাদ নিয়ে যেত পূজার পাঁচ দিনই। অল্পবয়সী বৌ-ঝিরা রান্নার ঘরে দায়িত্ব নিতেন কারণ এই পাঁচদিনে আমাদের এক হেঁসেলেই রান্না হত, বটকৃষ্ণ দাসের বাড়ীতে যেটা সাবেক বাড়ী।

মহাষ্টমীর দিন অঞ্জলি দেওয়ার ধূম পরে যেত। ছোট-বড় সবাই স্নান করে নতুন জামা-কাপড় পড়ে ঠাকুরদালানে হাজির, মায়ের সামনে অঞ্জলি দেবার জন্য। প্রসাদ বিতরনের পর আবার সন্ধিপূজার আয়োজন এই সময় একশ আটটি প্রদীপ জ্বেলে ঠাকুরের পূজায় বসতেন পুরুতমশাই।

এরপর মহানবমী। দিনটি ঘটনাবহুল একটি বিশেষ ঘটনা বলিদান। পূজার পর কাঁসি ঢাক বাজিয়ে একটি অনুষ্ঠান হতো। নাম ‘ধুনো পোড়ানো’। অনেকে সন্তান সন্ততির অসুখ বিসুখ হলে বা পরীক্ষার সাফল্যের জন্য মায়ের কাছে মানসিক করতেন। গায়ে ভিজে কাপড় জড়িয়ে হাঁটুর দুই হাতে মাটির মালসা এবং মাথায় কাপড়ের ওপর একটা। তাতে ঘুঁটে জ্বেলে অনবরত ধুনো ছিটোতেন উদ্যোক্তাদের একজন। আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতো, সময় নির্দিষ্ট করতেন পুরোহিত। তারপর সেই মালসাগুলো মাটিতে উপুড় করে ফেলে আগুন নিভিয়ে দেওয়া হত। এরপর বাড়ীর ছেলেমেয়েরা এসে মহিলার কোল ছুঁয়ে বসতেন। এতেই নাকি সব অকল্যাণ দূর হয়, মনবাসনা পূর্ণ হয়।

নবমীর আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বলীদান। কিন্তু কোন জীবিত প্রাণীকে বলি দেওয়া হত না। ঠাকুরের কাছে উৎসর্গীকৃত কুমড়ো আর আখ এককোপে কেটে মাকে দিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত।

নবমীর পূজা শুরু হতেই সকলের মনখারাপ। নিশি পোহালেই মাকে বিদায় দিতে হবে। তিনি পিত্রালয় থেকে স্বামীর গৃহে যাত্রা করবেন। তবে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা এ বাড়ীতে হত যেটা রাণাঘাটের অন্য কোন বাড়ীতে হতো না।

দশটি সিঁড়ি ভেঙে পূজামণ্ডপে ঢুকতে হতো। নীচে একটা বড় উঠোন ছিল। এখানে প্রতি বৎসর অস্থায়ী স্টেজ করে কোনবার গানের জলসা বসতো, কখনও বাড়ীর ছেলেমেয়েদের নিয়ে নাটক, নাচ, গান হতো। সারা উঠোন লোকে ভরে যেত।

নবমীর নিশি পোহালে শুরু হত বিজয়া পূজা। দেবীকে বিদায় জানাতে হবে। দশটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে তবে মূল মণ্ডপে ঢোকা যেত। দশমীর পূজা শেষে একটি তাম্রপাত্রে দেবীর মুখের ছায়া দেখে ঠাকুরমশাই চলে যেতেন। এরপর হত দেবীর বরণ। মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাতে সকলেরই চোখে জল। বাড়ীর সধবা মহিলারা ঠাকুর বরণ করতেন জল, মিষ্টি ও পান খাইয়ে। এরপর দুদিকে বাঁশ বেঁধে ঐ দশটা সিঁড়ি অতিক্রম করে ঠাকুর নামানো একটা বিরাট পর্ব্ব। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সকলে দাঁড়িয়ে দেখত। এবার ঠাকুর নিয়ে চূর্ণী নদীতে বিসর্জন দিতে হবে। মূল বাড়ী থেকে বেরিয়ে যে বাড়ী পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছে তার সামনের রাস্তা দিয়ে দেবীকে নিয়ে যাবার সময় গৃহকর্ত্রী মার কানে কানে বলে দিতেন 'সামনের বছর আবার এসো'।

নদীতে ঠাকুর বিসর্জনের পদ্ধতিরও একটা নতুনত্ব ছিল। পাশাপাশি দুটো নৌকো বেঁধে রেখে মাঝখানে আড়াআড়িভাবে প্রতিমা রাখা হত। নদীর দু'পাড়ে অজস্র লোক। নৌকা ঘুরে ঘুরে কিছুক্ষণ পরে আবার বাড়ীর ঘাটে নিয়ে এসে দুটো নৌকা আস্তে

আস্তে দু'দিকে সরে যেত, মায়ের মূর্তিও ধীরে ধীরে জলে পড়তে থাকত। তারপর যখন অল্প মুকুটটা জেগে আছে তখন নৌকা দুটো দু'পাশে সরে যেতেই দেবীর মূর্তি জলের সঙ্গে পড়ে যেত। বাড়ীর একজন পুরুষও মার সঙ্গে জলে নামত যেন মেয়েকে শ্বশুরবাড়ী পৌঁছাতে গেল।

রাত্তিরে পাঁচ শরিকের বাড়ীর প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ী গিয়ে বিজয়ার প্রণাম করতেন, ছোটদের আশীর্বাদ জানিয়ে মিষ্টি খাওয়ানো একটা বিরাট পর্ব। অনেক বাড়ীতে সিদ্ধির শরবৎ হত। বড়রা খেতেন ছোটদের ছোঁয়া নিষিদ্ধ। পঞ্চমীর দিন এরপর লক্ষ্মীপূজা ঐ একই মণ্ডপে হত। দোলও হত। দোলের আগের রাত্রে বাড়ীর সামনে চৌমাথার বিরাট বিচুলির তৈরী ন্যাড়া পোড়া হত।

দোলের দিন বিকেলবেলা পূজামণ্ডপের নীচে এবং বাড়ীর ও রাস্তায় পর্যন্ত বিরাট মেলা বসত। নানারকম খাবার জিনিস ও মাটির তৈরী বিভিন্ন রকমের পুতুল ইত্যাদি বিক্রি হত। আমাদের কর্তামা অর্থাৎ বাবার ঠাকুমা হাতে খুচরো পয়সা নিয়ে বসে থাকতেন। পাঁচ বাড়ীর ছোটরা সকলেই দু'টাকা করে পেত। তখনকার দু'টাকা এখনকার দুশো টাকার সমান। যা'র যা ইচ্ছে কিনে খেত। জিলিপি, সিঙারা, যেসব জিনিস বাড়ীর ছোটদের সাধারণত দেওয়া হত না। সেদিন সকলের অবাধ স্বাধীনতা।

আস্তে আস্তে সবকিছুই পরিবর্তিত হয়ে গেল।

আরতি, রানাঘাট

ছবি: সৈকত মুখার্জি

অঞ্জলি সেনগুপ্ত

আমার দেখা দুর্গা পূজা

অঞ্জলি সেনগুপ্ত। জন্ম ১৯৩৮ সালে অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে। দেশভাগের পর পুরো পরিবার সমেত চলে আসেন বীরভূম জেলার নগরী গ্রামে। নগরী স্কুলে থেকে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেন। ভালোবাসেন কবিতা পড়তে আর সেলাই করতে। 'সঞ্চয়িতা' আর জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' এই বই দুইখানি তিনি সব সময় হাতের কাছেই রাখেন। টুকিটাকি কাজ করতে করতে আপন মনে কবিতা বলে যান আজও।

মা

তখনকার পূর্ববঙ্গে মানে বর্তমান বাংলাদেশে আমার জন্ম। সালটা ইংরেজির ১৯৩৮। মায়ের মুখে শুনেছি সেটাও ছিল এমনই এক আশ্বিন মাস এবং দুর্গা পুজোর ষষ্ঠীর দিন। তখনকার ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার একটা ছোট গ্রাম ডহরপাড়া ; সেই ডহরপাড়া গ্রামে আমার জন্ম।

বিয়ের আগে আমার পদবি ছিল চৌধুরী। জাতে বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। আমাদের চৌধুরী পরিবারেই তিনটে পুজো হতে আমি দেখেছি। আমি বলছি আমার শৈশবের এবং বালিকা বয়সের দেখা দুর্গা পুজোর কথা। তখনো দেশভাগ হয় নি। আমাদের ছিল যৌথ পরিবার। কিন্তু কর্মসূত্রে আমার বড় কাকা, সুন্দর কাকা ও ছোট কাকা যাকে আমি মনিকাকা বলে ডাকতাম তারা থাকতেন এ-বঙ্গে, শ্রীরামপুরের মাহেশ অঞ্চলে। বড়কাকা তখন বঙ্গলক্ষ্মী

কটন মিলে উচ্চপদে কাজ করতেন। মনিকাকা, সুন্দরকাকা সবাই তখন উপার্জনশীল। আমার বাবা, মা, আমি মানে আমরা ও অন্য জ্ঞাতি কাকারা থাকতাম দেশের বাড়ি কোটালিপাড়ায়। বাবার তখন নির্দিষ্ট কোন চাকরি ছিল না। আমরা জমিদার ছিলাম না, কিন্তু খেয়ে পরে বাঁচার মত কিছু জমি আমাদের ছিল। তাতে আমাদের দিব্বি চলে যেত।

চারদিকে জল অর্থাৎ নদী খাল বিলে ঘেরা ছিল আমার গ্রাম। এই শরৎকাল এলেই প্রায় সবার বাড়িতে ফুটত শিউলিফুল। দীঘিতে ফুটত শাপলা, পদ্ম। কালো মেঘ সরে গিয়ে সাদা মেঘ ভেসে যেত আকাশ জুড়ে। টের পেতাম পুজো আসছে। পুজোর প্রস্তুতি তখন সব ঘরে ঘরে। ঘর দোর ঝেড়ে মুছে পরিষ্কার করা হত। ভাদ্রের রোদে তোরঙ্গ খুলে তুলে রাখা জামা কাপড় আর লেপ কাঁথায় রোদ লাগান হত। মা কাকিমার সঙ্গে আমরাও ছোট ছোট হাতে হাত লাগাতাম। বেশ ভালই লাগত। আসলে পুজোর সময় কাকারা বাড়ি ফিরে আসতেন। ঠাকুমা, কাকা-কাকিমা আর সব জ্ঞাতি ভাইবোনেরা মিলে সে এক হইহই ব্যাপার।

ডহরপাড়া, মদনপার আর আমার জ্ঞাতি দাদা-শঙ্করদাদের বাড়িতে মিলে মোট তিনটে পুজো আমাদের চৌধুরীদের হত। পালপাড়া থেকে কুমোর কাকা এসে মণ্ডপে মূর্তি গড়তেন। মহালয়ার দিন চক্ষুদান হত দেবীর। তারপর তো সেই মূর্তি ঢেকে রাখা হত! তবু আমরা ছোটরা ঘুরে ফিরে যেতাম যে কতবার দেখতে!

কাকাবাবু সপ্তমীর দিন আমাদের জন্য কলকাতা থেকে ছিট কাপড়ের থান নিয়ে যেতেন। ওই থান থেকেই তৈরি করা ফ্রক

আমি আর সেজদি পরতাম। আমাদের তাই নতুন জামা পুজোয় পরা হত না। তাতে অবশ্য আমাদের খুব একটা অসুবিধা হত না। আমার ছোটভাই কেষ্ট এই সময়টা মণ্ডপে ঘুরে বেড়াত। এবার কী পালা হবে, কে কে অভিনয় করছেন, সব খবর ও আর শঙ্করদা রাখত। আর দৌড়ে এসে আমায় বলত। খুব মনে পড়ে একবার পুজোয় দাদা আমার জন্য একটা তৈরি ফ্রক এনেছিলেন। দাদাও তো শ্রীরামপুরে থাকতেন, কোন একটা পত্রিকায় লেখা ছাপা হয়েছিল দাদার। সেখান থেকে পাওয়া টাকায় সেবার আমার নতুন জামা হয়। একথা আজ বিরাশি পার করেও বেশ মনে পড়ে।

পুজোর কটা দিন আমরা কিন্তু আমিষ খাবারই খেতাম। আমাদের বাড়ির পুজোয় তখনো পশুবলি হত। নবমীর দিনটা ছিল ভয়ংকর। সেদিন রক্তে ভেসে যেত দালান। ন'টা পশু বলির রেওয়াজ ছিল। আমি দেখতে যেতাম না। আমার একদম ভাল লাগত না। পরে অবশ্য পশুবলি বন্ধ হয়ে যায়। আমিও স্বস্তি পাই।

বরং আমার ভাল লাগত ওই চারদিন যে যাত্রাপালা আর পালাগান হত তা দেখতে। শঙ্করদা আমার থেকে মাত্র দশ মাসের বড়, ও যাত্রায় গান গাইত। খুব সুন্দর গলা ছিল ওঁর। শঙ্করদা আজ আমাদের মধ্যে নেই। ওঁর মা আমার নিজের মাসি, আর ওঁর বাবা আবার আমার জ্ঞাতি কাকা। আমরা দুজনেই সমবয়সী। কিন্তু তখন এইসব যাত্রাপালা বা পালাগানে মেয়েরা অংশ নিতে পারত না। মহিলা চরিত্রে কোন ছেলেই মহিলা সেজে অভিনয় করত। আমরা মেয়েরা ছিলাম দর্শক

তবে পুজোর কটা দিন বাড়ির মেয়েদের সারাদিন দম ফেলার জো ছিল না! কত কাজ! নারকেল নাড়ু, উপড়া, মালপোয়া, নিমকি সবই তো ঘরে তৈরি করতে হত। বাংলাদেশের গ্রামে তখন মিষ্টির দোকান কই? ঘরে তৈরি মিষ্টি দিয়েই চলত বিজয়ার মিষ্টি মুখ। দশমীর দিন গ্রামের দীঘিতেই দুর্গা প্রতিমা নিরঞ্জন হত।

ঠিক যখন ষোল বছর বয়স তখন তো দেশ ছেড়ে এদেশে এলাম। ভাবতাম এই দেশভাগ মিছামিছি। ওই কাঁটাতার একদিন উঠে যাবে। আমরা আবার ফিরে যাব সেই কোটালিপাড়ায়। আবার আমি ভাই কেষ্ট, সেজদি, দাদা দিদি সবাই ঠাকুরদালানে বসে পালাগান শুনব। কেউই আর নেই আজ। কেবল আমি আছি একরাশ স্মৃতি আকড়ে। বোধহয় বয়স হয়েছে তো! তাই দুর্গা পুজোর কথা উঠলে সেই ছোটবেলার দেখা স্মৃতির কথাই মনে ভেসে ওঠে। এলোমেলোভাবে ভেসে ওঠে সেই কবেকার ঠাকুর দালানে দেখা মায়েদের ঠাকুর বরণ! স্মৃতিতে ফিরে ফিরে যাই সেই দিনগুলোতে, শুধু পাশে থাকা সেদিনের সেই চেনা মুখগুলোকে খুঁজে পাই না!

এখন তো পুজোর দিনগুলোতে ঘরেই থাকি। জানি না এবার পুজোয় কী করে কী হবে! মানুষ ভাল নেই। তাই কামনা করি এই মহামারীর হাত থেকে আগামী পৃথিবী যেন রক্ষা পায়। সবাই যেন ভাল থাকে।

(অনুলিখনে: ছোট পুত্রবধূ - রূপা সেনগুপ্ত)

সন্ধিপুজো, রানাঘাট

ছবি: সৈকত মুখার্জি

গোপা দাশগুপ্ত

ফিরে দেখা দুর্গা পুজো

গোপা দাশগুপ্তর জন্ম ১৯৩৮-এ মৈমনসিংহ জেলায়।
তাঁর পড়াশোনা-বেড়ে ওঠা কলকাতায়।
বর্তমানে তিনি কলকাতার বাসিন্দা।

মা

আমার জন্ম বৈশাখে। ইংরাজির ১৯৩৮। মৈমনসিংহে। একটু বড় হলে কলকাতার দর্জিপাড়ায় চলে আসা বাবার সাথে। তার আগেই আমাদের বড়দা চলে এসেছিল আমার কাকার সাথে। এখানেই আমার পড়াশোনা আর ছোটবেলার পুজোর স্মৃতি। বিডন স্ট্রিটের পুজোর সাথে ছোটবেলা কাটে। বাবা কাজ করতেন সন্তোষের মহারাজার এস্টেটে, ময়মনসিংহে থাকার সময় থেকেই। কলকাতাতেও তিনি বহাল ছিলেন। মাঝে মাঝে ওনাদের পারিবারিক লাইব্রেরির দেখাশোনাও করতেন তিনি। বাড়িতে বই আনতেন তিনি সেখান থেকে মাসিক বসুমতী থেকে শরৎচন্দ্র নানারকম।

তারপর আমাদের পাঁচ ভাইবোনকে নিয়ে বাবা চলে এলেন কসবায়। কসবা কলকাতার পুরনো অঞ্চল। আমার কাকা যিনি

রেলে চাকরি করতেন, তিনি ওখানেই বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। আমাদের নিজেদের বাড়ি হল। মাটির দেওয়াল আর টিনের ছাউনির। কসবাতে যখন এলাম তখন আমি বেশ বড়। পনেরো ষোল বছরের। বাড়ির উলটো দিকে চিত্তরঞ্জন হাইস্কুল, সেখানে দুর্গা পুজো হতো, এখনও নাকি হয়। আমার এক কাকা সুরেশ সেনগুপ্ত, ঠাকুর বানাতেন। সেই পুজোর স্মৃতি এখনও সজাগ। দিনেকালে কত রাজনৈতিক টানাপোড়েন গেল কিন্তু পুজো বন্ধ হয়নি কখনো। বাহাত্তরে যখন পাশেই শ্যামদের বাড়ির গোড়ায় চাঁদু মার্ডার হল, পুজোর আগ দিয়েই, সেবার ও বন্ধ হয়নি। আর ছিল জলসা। কত নামীদামী আর্টিস্টরা গান বাজনা করে গেছেন ইয়ত্তা নেই। পরে কসবা ইয়ুথ-এর ফাংসান-এও আসতেন তাঁরা।

আর একটা পুরনো পুজো ছিল ৭০ পল্লির পুজো—বিখ্যাত ডাক্তার হরিহর ব্যানার্জি, যাঁর ছেলে অমরনাথ ব্যানার্জি, তাঁদের বাড়ির উলটো দিকে রক্ষাকালীতলায় এখনো হয়।

আমি বিয়ের পরে চলে আসি সুচেতানগরে। সেখানেও পুরনো পুজো ছিল। আর ছিল বাড়ির লক্ষ্মী পুজো। আমাদের বাড়ির চন্দ্রপুলি আর তোকতির কদর ছিল খুব। লক্ষ্মী পুজোতেও তার রেশ থাকতো। বিজয়ার আগের রাতে বানাতে বসতাম সবাই মিলে। আমরা তো আমার কাকা শ্বশুরের বাড়িতে থাকতাম, আমার সাথে আমার খুড়শাশুড়ি আর ননদ রত্নাও থাকতো। কাকিমার হাতে চন্দ্রপুলি কেমন চিকন হয়ে উঠত দেখতাম। সাথে নোনতাও হতো। আমাদের বাড়ি একটা বড় ভিড় লেগেই থাকতো পাশের মিলনায়তন ক্লাব এর সদস্যদের। ওদের জন্য আলাদা করে ঘুগনি বানাতাম নারকোল দিয়ে। বেশ হইচই হতো।

এখন যেন কেমন মিইয়ে গেছে সব। যদিও বাড়িতে ছোট ছেলে ঠাকুর বানায় ফি বছর। কেনা মিষ্টি নিয়ে বিজয়া সারতে কেউ কেউ আসে। তবে মাঝে মাঝে রক্ষাকালী তলা দিয়ে গেলে ৭০ পল্লির ঠাকুরের মুখ ভেসে ওঠে।

(অনুলিখন: দুর্গা দাশগুপ্ত)

মুক্তি রায়

দুর্গোৎসব

মুক্তি রায়ের জন্ম ১৯৪৫-এ। তাঁর ছোটোবেলা কেটেছে অসমের চা-বাগানে। বিবাহসূত্রে তিনি নবদ্বীপের বাসিন্দা হন। পরবর্তীকালে সপরিবারে তিনি কৃষ্ণনগরে বসবাস শুরু করেন।

মা

জীবন সায়াহ্নে এসে ছেলেবেলার পুজোর স্মৃতি নিয়ে কিছু কথা বলতে বেশ ফাঁপরে পড়ে গেলাম যেটুকু মনে পড়ছে...

আসামের কাছাড় জেলার'লঙ্গাই টি এস্টেট' চা বাগান—ইংরেজ সাহেবদের দ্বারা পরিচালিত। ছোটবেলাটা কেটেছে এই বাগানে, বাবা ছিলেন এই বাগানের ম্যানেজার। তিন দাদা, ছয়বোন আমি বড়। ছোট ছোট টিলার ওপর আমাদের বাংলো টাইপের কোয়াটার। বাগান থেকে বাড়ির ফুলবাগান, গরু দেখাশোনা আরো সাংসারিক সব কাজের জন্য লোক আসতো। চারদিকে প্রচুর সবুজ। জায়গাটা আসাম রাজ্যে হলেও বেশিরভাগ প্রায় সবাই বাঙালী, ওপার বাংলার লোক, সিলেটি ভাষা। বাগানে তখন একটাই দুর্গা পুজো। কী উত্তেজনা! এখনকার ছেলে মেয়েদের মতো প্যান্ডেল প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়ানোর মতো

সুযোগ আমাদের ছিল না, অবশ্য তা নিয়ে ভাববার কথা ভাবতেই জানতাম না। বড়দাদা ও ছোটদাদা কলকাতা কলেজে পড়তেন। পুজো আসা মানে দাদারা ঘরে ফিরবে। তখন তো এখনকার মতো মল কালচার ছিল না আর আমাদের ওখানে দোকানই বা কোথায়? মা আমাদের ছয় বোনের জামা নিজের হাতে সেলাই করে বানিয়ে দিতেন। এখন ভাবি সাংসারিক দায়-দায়িত্ব সামলে মা কী করে আমাদের এতগুলো জামাকাপড় বানিয়ে দিতেন! মহালয়া এসে যাওয়া মানে পুজো এসে গেল, আগের দিন রাত থেকে বারবার ঘুম ভেঙে যেত।

বাবা বাড়ির বড় রেডিওটাতে নতুন ব্যাটারি ভরে নিতেন আগের দিনই। অন্যদিন এত সকালে ঘুম না ভাঙলেও মহালয়ার ভোরে খুব তাড়াতাড়ি উঠে বসে পড়তাম সবাই মিলে রেডিওর সামনে। আসামে তখন ভোরের দিকে একটু ঠাণ্ডা আমেজ তাই কাঁথা জড়িয়ে চেয়ারে বসে মহালয়া শোনা। চারদিক থেকে ভেসে আসছে শিউলির গন্ধ, স্থলপদ্ম গাছগুলোতে কুঁড়ি থেকে ফুল ফুটছে। সে যে কী অনুভূতি! এরপর এসে যেত পুজো। বাবা ষষ্ঠীর দিন মা ও আমাদের সোনার গয়নাগুলো বের করে সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিতেন, চোর ডাকাতের ভয় ছিল না, আমরা দিব্যি নতুন জামা কাপড়ের সাথে গয়নাগাটি পরে মণ্ডপে বসে থাকতাম। মা, কাকিমা ও জেঠিমারাও প্রতিদিনের গয়নাগাটি খুলে পুজো স্পেশাল গয়নায় সালংকারা। বারবার বাড়ি আর মণ্ডপ। খাওয়া-দাওয়া বাড়িতেই হত। সন্ধ্যেবেলা প্রতিদিনই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রামলীলা আবার কখনো যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হতো, বহিরাগত শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে। একদিন বাগানের

মানুষদের নিজেদের অনুষ্ঠান থাকতো। রিহার্সাল হত আমাদের বাড়ি, বাইরে থেকে প্রশিক্ষক আসতেন নাচ গান শেখানোর জন্য। নাচের জন্য মনিপুরী ছেলেদের আনা হতো, তারাও আমাদের বাড়িতেই থাকতো। একটাই তো পুজো—বাগানের সবাই মিলে খুব মজা করে পুজোর চারটে দিন কেটে যেত। এরমধ্যেই বিজয়ার মিষ্টি মুখের প্রস্তুতি চলতো, মায়ের সাথে বাড়িতে নাড়ু, নিমকি বানানোর কাজে হাত লাগাতাম। দশমীর দিন খুব মন খারাপ লাগতো। মা দুর্গা চলে যাওয়ার পর শূন্য মণ্ডপ, হাহাকার করে উঠতো মনটা। সন্ধ্যেবেলা বাগানের স্টাফদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রণাম আর নাড়ু খাওয়া...

এ তো গেলো ছোটবেলার কথা। ছোটবেলার এরকম অনাড়ম্বর আনন্দ বেশিদিন রইল না। কিশোরী বেলা আমার মেয়েবেলায় পৌঁছতেই আসামে শুরু হল বঙ্গাল-খেদা আন্দোলন। যদিও বাঙালি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা থাকতাম তবুও বড় হচ্ছিলাম তো, তাই বাবা আমাদের বোনেদের পাঠিয়ে দিলেন কলকাতায়। এখানে বেকবাগান অঞ্চলে থাকতেন মামাতো দিদি জামাইবাবু, তখন আপন দাদা দিদি এই বোধটা না আমাদের মধ্যে ছিল না। মায়ের বড় ভাইঝি মায়ের থেকে হয়ত বছর তিনেকের ছোট তাকেই আমরা সব ভাইবোনেরা ডাকতাম বড়দিভাই বলে। বড়জামাইবাবুর কাছে থেকে প্রথম কলকাতার পুজো দেখলাম। এখনকার বেকবাগান দেখলে তখনকার বেকবাগান কিন্তু বোঝা যাবে না। বাড়ির সামনে দুর্গা পুজো। সন্ধ্যেবেলা দিদি জামাইবাবুর সাথে সপরিবার ঠাকুর দেখতে যাওয়া। একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা হত, সবাই মিলে সেই গাড়িতে ওঠার পর ঘোড়া এত লোক

নিয়ে টানতে পারত না; অগত্যা শুরু করতাম হাঁটা। উত্তর মধ্য কলকাতার বিভিন্ন মণ্ডপে তখন ঠাকুর দেখতে গিয়েছি। বড় বড় সব প্যান্ডেল পুজো কমিটির নাম এখন আর মনে নেই শুধু মনে পড়ে মোহাম্মদ আলী পার্ক, কলেজ স্কোয়ারের ঠাকুর দেখতে যাওয়ার কথা।

প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে কিভাবে এগোতে হবে, জামাইবাবু বলতেন, "দেখ এইভাবে একবার ডান হাতের কনুই আর একবার বাঁ হাতের কনুই দিয়ে ঠেলবি দেখবি ঠাকুরের কাছে পৌঁছে গেছিস"। বেশ মজার ছিল দিনগুলো। নতুন জুতো, তখন তো আবার শাড়ি, শাড়ি সামলে হাঁটতে গিয়ে পিছিয়ে পড়তাম আবার দৌড়াতে দৌড়াতে এগিয়ে যাওয়া....

এরপর বউ বেলা। বিয়ে হয়ে এলাম অপছন্দের জায়গা নবদ্বীপে। শ্বশুর শাশুড়ি ননদ নিয়ে ছোট সংসার কিন্তু ছাত্র ছাত্রী স্বামীর রাজনৈতিক বন্ধুবান্ধব নিয়ে বিশাল বড় পরিবার। বামপন্থী স্বামীর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রচুর কর্মকাণ্ড থাকলেও সার্বজনীন পূজা কমিটির সাথে একেবারে নৈকট্য ছিল না। নবদ্বীপে বাড়ির সামনে একটি বাড়িতে পুজো হত, ঢাকের আওয়াজ, ধুনোর গন্ধ ভেসে আসতো বেশ লাগত। ঠাকুর দেখতে যেতাম। কিন্তু মণ্ডপে গিয়ে দশমীর সিঁদুর খেলা বা অষ্টমীতে ভিড় ঠেলে দুর্গা মাকে অঞ্জলি দেওয়া এসব কোনদিনই করিনি। সেযুগে স্বল্প বেতনের স্কুলশিক্ষকের স্ত্রী, পুজোয় সামান্য একটি নতুন সুতির শাড়ি পাওয়াটাই ছিল অনেক...

এখন শুধুই দিন কেটে যাচ্ছে। টুকটাক রোগ নিয়ে অপেক্ষা করছি করোনা আবহে উমার আগমনের।

কৃষ্ণনগর রাজবাড়িতে সিঁদুরখেলা

ছবি: সৈকত মুখার্জি

দীপালি বিশ্বাস

ছোটবেলার দুর্গোৎসব

১৯৪৫-এ মুর্শিদাবাদ জেলায় দীপালি বিশ্বাসের জন্ম। বহরমপুর কলেজ ও কৃষ্ণনগর কলেজে তাঁর শিক্ষালাভ। তাঁর কর্মজীবন কেটেছে হাঁসখালি সমবায় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে।

মা

আমার ছোটোবেলা কেটেছে বর্ধিষ্ণু একটি গ্রামে। পূজার কিছুদিন আগে থেকেই আমরা আনন্দে আপ্লুত থাকতাম। আমার এক দাদা হলদিয়ায় চাকরি করত। দাদা পূজার জামাকাপড় আনবে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম।

তখন আমাদের গ্রামে ২/৪টি পূজা হত। ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সব ধর্মের লোক আনন্দ উপভোগ করত। আমাদের বাড়ির পাশেই ছিল একটি পূজামণ্ডপ। ষষ্ঠীর দিন সকালেই পূজামণ্ডপে চণ্ডীপাঠ শুরু হত। ঢাকের বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠতো। প্রতিবার পূজায় আমরা কয়েকজন মিলে একটা পত্রিকা বার করতাম। কোন কোন বৎসর আবৃত্তি গান ও নাচের অনুষ্ঠানও হোত। আমাদের ছোটবেলায় একচালি ঠাকুরই হোত। কোন কোন বৎসর আমাদের সদর শহর বহরমপুরে পূজা দেখতে যেতাম। সেখানে কোন পূজামণ্ডপের প্যাণ্ডেলের কারুকার্য চোখজুড়ানো,

কারো আলোকসজ্জা চোখধাঁধানো। তবে আমাদের গ্রামের পূজায় যেন আলাদা একটি আন্তরিকতা আছে।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিন পাড়ার সমবয়সী কয়েকজন বন্ধু ও ভাইবোনদের নিয়ে পূজামণ্ডপে খুব আনন্দে কাটাতাম। সপ্তমী ও অষ্টমীর দিন আমার দুই দাদা ও দাদার বন্ধুরা আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী বর্ধিষ্ণু গ্রাম ‘চক’ ও ইসলামপুরে প্রতিমা দর্শন করতে নিয়ে যেত। ওখানে বেশ কয়েকখানা ঠাকুর দেখে বাড়ি আসার সময় পাঁপড়ভাজা, জিলাপি, বাদাম খেয়ে বাসে করে বাড়ি ফিরতাম।

সপ্তমী অষ্টমী নবমীর পর আসে ‘দশমী’, দেবীর বিসর্জনের পালা। আমরা জলঙ্গী নদীতে ‘বাইচ’ দেখতে যেতাম। বিসর্জন হয়ে গেলে বিষণ্ন বদনে বাড়ি ফিরে বড়দের শুভবিজয়ার প্রণাম করতাম। তাঁরা আশীর্বাদ করতেন এবং মায়েদের হাতের নাড়ু, মুড়কি, নানান রকমের মিষ্টি খাওয়াতেন। তখন ‘মোবাইল’ ছিলনা তাই ডাকঘর থেকে পোষ্টকার্ড এনে দূরের আত্মীয়স্বজনদের শুভবিজয়ার প্রণাম জানাতাম ও ছোটদের আশীর্বাদ জানাতাম।

এইভাবে আমাদের ছোটবেলার দুর্গাপূজার তিনটি দিন কাটত। ছোটবেলার অনাবিল আনন্দ উপভোগ করেছি। এখন জাঁকজমক সহকারে পূজা হলেও পূজার বাহ্যিক আড়ম্বর যেমন প্যাণ্ডেলের কারুকার্য, লাইটিং-এর মনমাতানো দৃশ্য আনন্দদায়ক হলেও ছোটবেলায় যে আনন্দ ছিল তা ভুলবার নয়।

বিসর্জনের পথে, রানাঘাট

ছবি: সৈকত মুখার্জি

বিসর্জনের পথে, শান্তিপুর

ছবি: সৈকত মুখার্জি